

বাবা সাহেব

ড: আশ্বেদকর

রচনা-সস্তার



17

বাবা সাহেব

ড. আশ্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

সপ্তদশ খণ্ড



বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১

মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

‘জাতি সৃষ্টি করতে হয়, তার অস্তিত্ব থাকে না। আমি মনে করি যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট ও পৃথক সম্প্রদায়কে অবদমন করে নতুন জাতি সৃষ্টি করা যায় না। এ-কথা হয়তো সকলেই মানবেন। দ্বিতীয়ত, এটা মানা হয়েছে যে, সংসদে অচ্ছুৎদের প্রতিনিধিত্ব করবে অচ্ছুৎরাই। সুতরাং অচ্ছুৎরাই যে অচ্ছুৎদের যথার্থ প্রতিনিধি, সেটা অস্বীকার করা যায় না। আবার সেটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে অচ্ছুৎদের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব উঠে আসবে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে। এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুক্তি অ-সমর্থনযোগ্য এবং অন্তঃসারশূন্য। অচ্ছুৎদের রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিকে হিন্দুরা মেনে নিয়েছে। পৃথক নির্বাচন এই ভিত্তির-ই যুক্তিসঙ্গত পরিণাম।’

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
‘যৌথ নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচন’ থেকে

AMBEDKAR RACHANA-SAMBHAR
(Collected Works of Dr Ambedkar in Bengali)

Volume-17

Total No Pages : 112 including 5 pages Index

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৯

First Published : November, 1999

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :

ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি -১১০ ০০১

Published by

Dr. Ambedkar Foundation,
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India,
New Delhi-110 001.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং

ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :

সাধারণ সংস্করণ : ২৫ টাকা (Rs. 25/-)

শোভন সংস্করণ : ৮৫ টাকা (Rs. 85/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :

ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :

পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী

মাননীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস

সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

শ্রী এস. কে. বিশ্বাস, আই. এ. এস

অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

ড. এম. এস. আহমেদ, আই.এ.এস.

যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

সদস্য সচিব, ড. আয়েদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা বালা, আই. এ. এস

সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী

কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড. ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস

যুগ্ম নির্দেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি

কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

কৃষ্ণ লাল

নির্দেশক, ড. আয়েদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল

সম্পাদক

আশ্বেদকর রচনা-সম্ভার

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
ভবেশ দাস

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল



सत्यमेव जयते

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আশ্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। 'শ্রী গান্ধী ও অস্পৃশ্যদের মুক্তি' শীর্ষক এই আলোচনাটি বাবা সাহেব ড. আশ্বেদকর ১৯৪২ সালে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেশনস'-এর ভারতীয় শাখার আমন্ত্রণে কানাডার কিউবেকে মঁ-ট্রম্বল-এ উক্ত সংস্থার অধিবেশনে পাঠ করেন এবং পরে ১৯৪৩ সালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার এই মূল্যবান প্রবন্ধটি ইংরেজিতে 'ড. আশ্বেদকর রচনা-সম্ভার'-এর নবম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে প্রকাশ করেছেন। এটি একটি জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণাত্মক রচনা এবং পাঠকের পক্ষে খুব-ই উপযোগী।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী

নতুন দিল্লি

নভেম্বর, ১৯৯৯

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আশ্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আশ্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন। ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য হল :—

(১) ড. আশ্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয় স্থাপন, (২) ড. আশ্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন, (৩) ড. আশ্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি প্রদান, (৪) ড. আশ্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করা, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আশ্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ করা, (৬) ড. আশ্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান এবং (৭) দিল্লির ২৬ আলিপুর রোডে ড. আশ্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক প্রতিষ্ঠা করা।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের 'সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক'র সচিব শ্রীমতী আশা দাস, আই.এ.এস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার প্রয়াসে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় সপ্তদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই ফাউন্ডেশনের নির্দেশক কৃষণ লালকে। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরও যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আশ্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

নতুন দিল্লি

নভেম্বর, ১৯৯৯

ড. এম. এস. আহমেদ

সদস্য-সচিব

ড. আশ্বেদকর ফাউন্ডেশন

সম্পাদকের নিবেদন

দলিত সমাজকে অবহেলা করে কি ভারতে গণতন্ত্র সফল হতে পারে? এ-রকম একটি মৌলিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই বর্তমান খণ্ডটি রচিত। হয়তো কোনও বিবেকবান নাগরিক-ই এ-কথা স্বীকার করবেন না যে, সামাজিক অসাম্যকে বাঁচিয়ে রেখে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব। অথচ ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকাল ধরে এই সমাজ-ব্যবস্থা পাষণ-প্রতিমার মতো দণ্ডায়মান। স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্বাভাবিক মাত্রায় চঞ্চল মুহূর্তেও এই অবস্থার গ্রাস থেকে মুক্ত হয় নি আমাদের চেতনা। শ্রী গান্ধী এবং কংগ্রেস এ-ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন বলে ড. আশ্বেদকর বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। হয়তো কেউ-কেউ ড. আশ্বেদকরের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু ড. আশ্বেদকর যে-সব যুক্তি এই গ্রন্থের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, তার মূল্য অপরিসীম এবং ভারতে দলিত শ্রেণীর মুক্তির ইতিহাসে সেগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত নবম খণ্ডে এই অংশটি রয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি অনুবাদেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদক, পরামর্শ-পরিষদের সদস্য এবং ড. আশ্বেদকর ফাউন্ডেশনের সকলকে সহযোগিতার জন্য অভিনন্দন জানাই। পাঠক কর্তৃক খণ্ডটি সমাদৃত হলে নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করব।

কলকাতা

নভেম্বর, ১৯৯৯

অধ্যাপক আশিস সান্যাল

সম্পাদক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৭
সদস্য সচিবের কথা	৯
সম্পাদকের নিবেদন	১১
ভূমিকা	১৭
অধ্যায়- ১ : অচ্ছুৎদের মোট জনসংখ্যা	১৯
অধ্যায়- ২ : অচ্ছুৎদের গুরুত্ব	২১
অধ্যায়- ৩ : অচ্ছুৎদের রাজনৈতিক দাবি	২৩
অধ্যায়- ৪ : হিন্দু প্রতিরোধ	২৬
অধ্যায়- ৫ : যৌথ নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচন	৩১
অধ্যায়- ৬ : নির্বাহিক	৩৫
অধ্যায়- ৭ : জন-কৃত্যক	৩৭
অধ্যায়- ৮ : পৃথক ভূ-বাসন	৩৯
অধ্যায়- ৯ : সংবিধান এবং জাত-পাত	৪৩
অধ্যায়-১০ : হিন্দু এবং তাদের বন্ধুদের কাছে কিছু প্রশ্ন	৪৭
পরিশিষ্ট বিষয়ে	৫৫
অধ্যায়-১১ : বিদেশিদের কাছে আবেদন	৫৭
নির্ঘণ্ট	১০৭

শ্রী গান্ধী

ও

আচ্ছুৎদের মুক্তি

ভূমিকা

গত বছর অগাস্ট মাসে 'ইনস্টিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেসনস্'-এর ভারতীয় শাখার সভাপতির আমন্ত্রণে ভারতের অচ্ছুৎদের সমস্যা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ কানাডায় কিউবেকের মন্ট্রিয়াল-এ ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ঐ সংস্থার অধিবেশনের জন্য লিখি। প্রবন্ধটি সম্মেলন চলাকালীন ছাপা হয়। যখন-ই প্রকাশ পায় যে আমি এই ধরনের একটি প্রবন্ধ লিখেছি, তখন-ই এদের সমস্যার প্রতি আগ্রহী হয়ে এটিকে বই আকারে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশনের জন্য অচ্ছুৎবর্গ এবং আমেরিকার নেতৃবর্গ বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। এই অনুরোধ উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। অথচ এক-ই সময়ে, সম্মেলনের কার্যবিবরণী যতক্ষণ না সাধারণের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে ততক্ষণ আমি প্রবন্ধটি ছাপাতে পারছিলাম না, কারণ তা শিষ্টাচার ভঙ্গের সামিল। বর্তমানে 'প্যাসিফিক-রিলেসনস্' সম্মেলনের সম্পাদক আমায় জানিয়েছেন যে, সম্মেলনের কার্যবিবরণী সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি ইচ্ছে করলে প্রবন্ধটি বই আকারে প্রকাশ করতে পারি। সুতরাং লেখার দশ মাস পর এখন এটি ছাপার কারণ সুস্পষ্ট।

সামান্য কিছু মৌখিক পরিবর্তন ছাড়া প্রবন্ধটি সম্মেলনে যেমন পরিবেশিত হয়েছিল, ঠিক তেমন-ই ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধটি বলে দেবে বিষয়ের তাৎপর্য। শুধু একটি বিষয় আমি যোগ করতে চাই। সাধারণভাবে চিন্তাশীল মানুষ এই মর্মে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, সম্মেলনে তিনটি সমস্যা আলোচিত হবে। সেগুলি হ'ল; (১) সাম্রাজ্যবাদ (২) বর্ণ-বৈষম্যবাদ (৩) সীমাইট জাতি বিদ্বেষের বিরোধিতা (ইহুদি, আরব প্রভৃতি জাতি) এবং (৪) মানুষ মারার অবাধ বাণিজ্য বা চলতি কথায় যুদ্ধোপকরণের মুক্ত ব্যবসা বন্ধ করা। সন্দেহ নেই যে, এগুলিই হল জাতির প্রতি জাতির এবং মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতার এবং অমানবিক আচরণের রোগগ্রস্ত উৎসগ্রন্থি। কোনও সন্দেহ নেই যে, ভয়ংকর বিধ্বংসী এই যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে নতুন এক উন্নত পৃথিবী গড়ে তুলতে গেলে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতেই হবে। আমার ভয় ছিল এই, যে অস্পৃশ্যদের সমস্যা আজ অবধি যেমন ভুলে থাকা হয়েছে, তেমন-ই ভুলে থাকা হবে। তা হবে সত্যিই একটি বিপর্যয়। কারণ অচ্ছুৎরা যে অনায়াস-অবিচারে পর্যুদস্ত হয়ে চলেছে, তা ইহুদিদের মতো বহু বিজ্ঞাপিত না হলেও কম সত্যি নয়। অচ্ছুৎদের হিন্দুরা যে প্রক্রিয়ায় ও কৌশলে দমন করে চলেছে, তা নাৎসিদের ইহুদি দমন প্রক্রিয়া থেকে কম রক্তক্ষয়ী হলেও কম মর্মান্তিক নয়।

ইহুদিদের প্রতি নাৎসিদের সীমাইট জাতি বিদ্বেষ, অচ্ছুৎদের প্রতি হিন্দুদের সনাতন ধর্মের মতবাদ ও প্রয়োগ, কোন অংশে আলাদা নয়।

আজকের পৃথিবীর কর্তব্য অচ্ছুৎ এবং সমস্ত নির্যাতিত মানুষের শৃঙ্খল ভেঙে তাদের মুক্ত করা। আমি এই প্রবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে, এই সমস্যার প্রতি পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের এটাই সুবর্ণসুযোগ, যার তুলনায় ক্রীতদাস, নিগ্রো ও ইহুদিদের সমস্যা কিছুই নয়। আমি আশা করি, এই প্রবন্ধের প্রকাশ শান্তি-সম্মেলনে বিজ্ঞপ্তির কাজ করবে, যাতে কারণ অনুসন্ধান পর্ষদে (Board of Causes) এই সমস্যার গুণানি ও রায়দান হয় এবং হিন্দুরাও যাতে জানতে পারে যে, বিশ্ব-আদালতের দরবারে তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

বি. আর. আশ্বেদকর

২২, পৃথ্বীরাজ রোড

নতুন দিল্লী

১, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩

অধ্যায় - ১

অচ্ছুৎদের মোট জনসংখ্যা

এক সময় ভারতের দশমবর্ষীয় আদম-শুমার একটা সরল নিষ্পাপ কাজ ছিল যা শুধু মালখুসীয়েদের কাছেই আগ্রহের বিষয় ছিল। অন্য কেউ এতে আগ্রহ দেখাত না। বর্তমান যুগে আদমশুমার সকলের-ই আগ্রহের বিষয়। শুধুমাত্র পেশাগত রাজনীতিক নয়, ভারতের আম জনতাও এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তার কারণ ভারতের রাজনীতি এখন শুধুই পরিসংখ্যান-ভিত্তিক হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র পরিসংখ্যান-ই এক শ্রেণীর মানুষকে আর এক শ্রেণীর মানুষের ওপর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পথ করে দেয়, যা বিশ্বের কোথাও হয় না। এর ফলস্বরূপ ভারতের আদমশুমারের পরিসংখ্যান ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হয় রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য।

এই কারচুপিত হিন্দু, মুসলমান ও শিখরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। পরিসংখ্যানে আগ্রহ থাকলেও, অচ্ছুৎ এবং খ্রিস্টানদের এই কারচুপিতে কোনও হাত নেই। কারণ, আদমশুমার যারা পরিচালনা করেন, দেশের সেই প্রশাসনিক দফতরে অচ্ছুৎ এবং খ্রিস্টানদের কোন স্থান-ই নেই। অন্যদিকে অচ্ছুৎরা হ'ল সেই সকল মানুষ যারা হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের দ্বারা প্রতিটি লোক গণনায় চিহ্নিত হয়ে তাদের হাতে পরিসংখ্যানে কারচুপির শিকার হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের শেষ আদমশুমার বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পঞ্জাবের কিছু কিছু জায়গায় সেবার শিখরা অচ্ছুৎদের ওপর সুপরিকল্পিতভাবে পীড়ন এবং অত্যাচার করে। এর মূল লক্ষ্য ছিল, অচ্ছুৎদের দিয়েই বাধ্য করে তাদের শিখ বলে ঘোষণা করানো, যদিও তারা আসলে শিখ নয়। এর ফলে অচ্ছুৎদের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং শিখদের সংখ্যা ফুলে ফেঁপে ওঠে। অপরদিকে হিন্দুরা প্রচার করে, কেউ যেন জনগণনায় নিজের জাত উল্লেখ না করে। অচ্ছুৎদের প্রতি বিশেষ আবেদনও জানানো হয়েছিল।

অচ্ছুৎদের বলা হয়েছিল যে, তারা তাদের জাত উল্লেখ করে বলেই বিশ্বের কাছে তারা অচ্ছুৎ পলে পরিচিত এবং জাতের নাম উল্লেখ না করে তারা যে শুধুমাত্র হিন্দু, একথা বললেই তাদের হিন্দুদের সমান বিচার করা হবে এবং কেউ জানতেও পারবে না যে, তারা আসলে অচ্ছুৎ। এই কুট কৌশলের ফাঁদে অচ্ছুৎরা

সহজেই পা দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা গণনার সময় নিজেদের হিন্দু বলেই উল্লেখ করবে। এর ফল হল সুস্পষ্ট। অচ্ছুৎদের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং হিন্দু আরও সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেল। কিন্তু পরিসংখ্যানে ঠিক কতটা কারচুপি হয়েছে, তা বলা মুশকিল। তবে তার পরিমাণ যে ব্যাপক, সে ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। জনগণনায় প্রথম থেকে শেষ অবধি কারচুপি করা হয়েছে। কিন্তু এই কারচুপির ফলে শুধুমাত্র অচ্ছুৎরাই প্রভূত ক্ষতির শিকার হয়েছে। সে কারণে, অচ্ছুৎদের মোট জনসংখ্যা সঠিক মেনে নেওয়া যায় না। তবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আনুমানিক ছয় কোটি মানুষ যে অচ্ছুৎ, একথা বললে খুব একটা ভুল হবে না।

□ □ □

অধ্যায় - ২

অচ্ছুৎদের গুরুত্ব

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই এদের উপস্থিতি ছিল, ওয়ার্ড যাদের অভিহিত করেছেন ‘নীচুতলার মানুষ’ বলে। রোমানদের ছিল ক্রীতদাস, স্পার্টনদের ছিল হেলট বা ভূমিদাস, ব্রিটিশদের ভিলেন বা ভূ-স্বামীর ভৃত্য, আমেরিকানদের নিগ্রো এবং জার্মানদের ইহুদি। অনুরূপভাবে, হিন্দুদেরও রয়েছে অচ্ছুৎ। কিন্তু অচ্ছুৎদের মতো বিরূপ ভাগ্যের মুখোমুখি কাউকেই হতে হয়নি। ক্রীতদাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা বা প্রজাস্বত্ব প্রথা সব-ই বিলুপ্ত। অথচ অস্পৃশ্যতা আজও বর্তমান এবং হিন্দুত্ব যতদিন থাকবে ততদিন যে অস্পৃশ্যতাও থাকবে এটা হলফ করে বলা যায়। অচ্ছুৎদের অবস্থা ইহুদিদের থেকে অনেক খারাপ। ইহুদিদের যন্ত্রণা তাদের নিজেদের-ই সৃষ্ট। কিন্তু অচ্ছুৎদের তা নয়। অস্পৃশ্যতা সুপরিকল্পিত হিন্দুধর্মের কূটনীতির ফল যা বলপ্রয়োগের থেকেও নিশ্চিতভাবে দুর্দশা ডেকে আনতে সক্ষম। ইহুদিদের ঘৃণা করা হয় কিন্তু তাদের সঠিক বিকাশের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয় নি। কিন্তু অচ্ছুৎদের শুধু ঘৃণাই করা হয় না তাদের বিকাশের সমস্ত সুযোগ অস্বীকার করা হয়। তবুও ৬ কোটি অচ্ছুৎ শ্রেণীর মানুষের দিকে কেউ দৃষ্টিপাত করে নি, তাদের সমর্থন করা তো দূরের কথা।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যদি কোন মহৎ কারণ থেকে থাকে, তবে তা অচ্ছুৎদের কল্যাণের জন্যেই। হিন্দু বা মুসলমানদের স্বার্থ স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণ নয়। তাদের উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা নয় ক্ষমতা দখল। ফলে আমি খুব বিস্মতবোধ করি এই দেখে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনকারী কোনও দল বা সংগঠন এখনও অবধি অচ্ছুৎদের প্রতি আগ্রহী হয়নি। ‘দ্য নেশন’ নামে আমেরিকান একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে। ‘স্টেটসম্যান’ নামে ব্রিটিশদের একটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে। দুই-ই প্রভাবশালী। উভয়-ই ভারতের স্বাধীনতার বন্ধু। আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ভারতের স্বাধীনতার সমর্থকদের মধ্যে সংগঠিত দল হিসাবে আমেরিকান শ্রমিক এবং ব্রিটিশ শ্রমিক অন্যতম। আমি যতদূর জানি, এরা কেউ-ই অচ্ছুৎদের সমস্যা নিয়ে সরব হয় নি। এরা আসলে যা করেছে, তা কোন মুক্তিকামী মানুষ করত না। এরা শুধু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নামে একটি হিন্দু-সংগঠনের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। এখন

হিন্দুদের বাইরে, ভারতের সবাই নিশ্চিতরূপে জানে যে, নাম যাই হোক না কেন, কংগ্রেস আসলে হিন্দু পুঁজিপতিদের সমর্থনপুষ্ট মধ্যবিত্ত হিন্দুদের দল, যাদের আসল উদ্দেশ্য ভারতবাসীদের মুক্ত করা নয় বরং ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত স্থান থেকে ক্ষমতার দখল নেওয়া। এবং কংগ্রেস যে ধরনের স্বাধীনতা চাইছে তা যদি পায় তবে সন্দেহ নেই যে, হিন্দুরা অচ্ছুৎদের প্রতি সেই আগের মতোই ব্যবহার করবে। এ হেন উদাসীন পরিস্থিতির মাঝে ভারতের নতুন সংবিধানে অচ্ছুৎদের অবস্থান আলোচনার জন্য 'ইন্সটিটিউট অব প্যাসিফিক রিলেশনস'-এর সম্মেলনে এই প্রবন্ধ পেশ করার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য 'ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স'-এর ভারতীয় শাখা নিশ্চয়-ই ধন্যবাদ যোগ্য।

তবে আমি স্বীকার করতে চাই, নানা কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও যে নতুন সংবিধানে অচ্ছুৎদের অবস্থান নিয়ে প্রবন্ধ লেখার সময় বার করতে রাজি হয়েছি—তা আমার কাছেও সুখকর বিষয় এবং এক বিরাট স্বস্তি।

□ □ □

অধ্যায় - ৩

অচ্ছুৎদের রাজনৈতিক দাবি

অচ্ছুৎদের সমস্যা এক বৃহদাকার সমস্যা। আসলে কিছুকাল ধরে এই সমস্যা নিয়ে আমি এমন কাজ করছি যে, কয়েক'শ পাতা অবধি লিখে ভরাতে পারি। তবে আমি এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুধুমাত্র সমস্যার প্রকৃতি এবং অচ্ছুৎদের প্রস্তাবিত সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি মনে করি, ১৯৪২ এর ১৮ এবং ১৯ জুলাই নাগপুরে 'সর্বভারতীয়' তফসিলি জাতি সম্মেলনে' নিম্নে উল্লিখিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, প্রবন্ধের সূচনায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করার চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

সংবিধানে সন্মতি আবশ্যিক

‘এই সম্মেলন ঘোষণা করেছে যে, এমন কোনও সংবিধান তফসিলি জাতের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না

১) এতে তফসিলি জাতদের সন্মতি থাকে

২) এই সংবিধান স্বীকৃতি দেয় যে, তফসিলি জাতরা স্বতন্ত্র এবং হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভারতের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং

৩) নতুন সংবিধানের আওতায় তফসিলি জাত সম্পূর্ণ সুরক্ষা পায় এবং সে কারণে পরবর্তী প্রস্তাবগুলির সংস্থান থাকে।’

তৃতীয় প্রস্তাব

নতুন সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংস্থান

‘তফসিলি জাতদের মধ্যে এহেন সুরক্ষার জন্য এই সম্মেলন নতুন সংবিধানে

১. ১৯৩৫ সালের ‘ভারত শাসন আইন’ অনুসারে অচ্ছুৎদের তফসিলি জাত বলে অভিহিত করা হয়।

নিম্নে উল্লিখিত সংস্থানগুলির দাবি জানাচ্ছে।

১) প্রতিটি রাজ্যের বাজেটে তফসিলি জাতদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য চুক্তি নিশ্চিত বার্ষিক অর্থের পরিমাণ রাখতে হবে এবং তাদের উচ্চশিক্ষার জন্যও অপর একটি বার্ষিক অর্থের পরিমাণ রাখতে হবে, এবং এই খাতে ব্যয়কে সেই রাজ্যের রাজস্ব থেকে সর্বপ্রধান ব্যয় হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

২) সংখ্যা, প্রয়োজন এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের কার্যনির্বাহী সরকারে তফসিলি জাতদের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।

৩) সংখ্যা, প্রয়োজন এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে সমস্ত সরকারি নিয়োগে তফসিলি জাতদের প্রতিনিধিত্ব আইন দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে। এই সম্মেলন আরও দাবি জানাচ্ছে যে, বিচারালয়, পুলিশ এবং রাজস্বের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত দফতরে নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে তফসিলি জাতদের জন্য নির্ধারিত সংস্থান দশ বছরের মধ্যে পূরণ করতে হবে।

৪) সংখ্যা, প্রয়োজন এবং গুরুত্বের ভিত্তিতে সমস্ত রাজ্য পরিষদে এবং আঞ্চলিক সভায় তফসিলি জাতদের প্রতিনিধিত্ব আইন দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।

৫) সমস্ত পরিষদ এবং আঞ্চলিক সভায় পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে তফসিলি জাতদের প্রতিনিধিত্ব আইন দ্বারা সুরক্ষিত করতে হবে।'

চতুর্থ প্রস্তাব

পৃথক উপনিবেশ

‘এই সম্মেলনের মত অনুযায়ী,

(ক) তফসিলি জাতেরা যতদিন হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলের উপকণ্ঠে বাস করবে ততদিন মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে না। এর কারণ, জীবিকাহীন সংখ্যালঘু তফসিলি জাতেরা হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য গণ্য হওয়ার ফলে হিন্দুদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হতে থাকবে।

(খ) স্বরাজের আমলে হিন্দুরাজ বিরাজ করবেই এবং তখন তফসিলি জাতদের প্রতি হিন্দুদের নিপীড়ন বৃদ্ধি পেতে পারে। এই আশঙ্কায় তফসিলি জাতদের আরও সুরক্ষিত করার প্রয়োজন এবং

(গ) তফসিলি জাতের মানুষ হিসাবে পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক

সুরক্ষা দরকার, আর সে কারণেই অস্পৃশ্যতা দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন দীর্ঘ সুস্থিত আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ভারতের বর্তমান গ্রামাঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দুরা তফসিলি জাতদের ওপর অত্যাচার করে আসছে। এ সকল পরিবর্তনের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাংবিধানিক মতে সরকারের সাথে সাথে বর্তমান গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থাও এই আকারে পরিবর্তন করা যেতে পারে :

১) তফসিলি জাতদের পৃথক এবং হিন্দু বর্জিত স্বাধীন তফসিলি জাত-ভিত্তিক গ্রাম গঠন করার জন্য, বর্তমান বাসস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার সাংবিধানিক সংস্থান থাকা চাই।

২) তফসিলি জাতদের নতুন গ্রাম গঠনের এবং বসবাসের জন্য সংবিধানে একটি বিশেষ আবাসন কমিশন গঠনের সংস্থান রাখতে হবে।

৩) সরকারে সমস্ত চাষযোগ্য খালি জমি-ই এই কমিশনের তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে, যাতে এর সাহায্যে এই সকল জমিতে তফসিলি জাতের নতুন বাসস্থান তৈরি করতে পারে।

৪) এই কমিশনকে জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকদের থেকে জমি কেনার অধিকার দিতে হবে, যাতে তফসিলি জাতের বাসস্থানের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করা যায়।

৫) কমিশন যাতে এই প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ করতে পারে, তার জন্য বছরে পাঁচ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সরকারি অনুদানের সাংবিধানিক সংস্থান করতে হবে।

□ □ □

অধ্যায় - ৪

হিন্দু প্রতিরোধ

এই সকল প্রস্তাবে যে দাবি জানানো হয়েছে, তা মূলত তিন প্রকার—

- ১) রাজনৈতিক ২) শিক্ষা বিষয়ক
- ৩) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক।

রাজনৈতিক দাবিগুলি নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, তারা তিনটি বিষয়ের সুরক্ষা চাইছে :

১) সংসদ নিতান্তই জনপ্রতিনিধিসভা না হয়ে একযোগে নির্দিষ্টভাবে হিন্দু এবং অচ্ছুৎদেরও প্রতিনিধি-সভা হয়ে উঠতে হবে।

২) প্রশাসনকে শুধুমাত্র সংসদের অর্থাৎ হিন্দুদের প্রতিই দায়ি থাকলে চলবে না বরং হিন্দু এবং অচ্ছুৎ, উভয়ের কাছেই দায়ি থাকতে হবে।

৩) প্রশাসন শুধুমাত্র যোগ্য হলেই চলবে না, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের এবং অচ্ছুৎদের কাছেও বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। এই প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অচ্ছুৎদের যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকবে, যাতে কিনা অচ্ছুৎরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখতে পারে।

অচ্ছুৎদের এই সব রাজনৈতিক দাবি হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। অচ্ছুৎদের বন্ধু শ্রী গান্ধী এই সব দাবি মানার চেয়ে আমরণ অনশনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হলেও এই সকল দাবিকে সম্মত বলে মেনে নিতে পারেন নি। অতএব এবার আমি হিন্দু বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের রূপরেখা তুলে ধরছি। এই সরকারের—

- ১) সংসদ অঞ্চল-ভিত্তিক আসন থেকেই নির্বাচিত হবে।
- ২) সংসদের সংখ্যা গরিষ্ঠ দল থেকেই কার্যনির্বাহি সরকার গঠিত হবে।
- ৩) শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই সরকারি চাকরি ও নিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসন চালিত হবে।

কংগ্রেসের হিন্দুরা তাদের এই একান্ত নিজস্ব পরিকল্পনাটিকে জাতীয় নীতি আখ্যা দিয়ে অচ্ছুৎদের প্রস্তাবিত নীতিকে সাম্প্রদায়িক বলে ঘোষণা করেছে। এই ধরনের আরোপ যে ভিত্তিহীন তা আমি অচিরেই প্রমাণ করব। এটা আসলে অপছন্দের যে কোনও জিনিসকে খারাপ বলে দূরে সরিয়ে রাখার মতোই অজুহাত মাত্র। তবে কোনও বিষয়ের ভেতরেই দুর্বলতা নিহিত থাকলে তাতে এই কৌশলে শক্তিশালী করা যায় না। এই দুর্বলতা প্রকাশ করতে আমি জাতীয় নীতির গুণাবলী তুলে ধরব। তবে তা করার আগে এই দুই নীতির সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। উভয়ের-ই এক-ই উদ্দেশ্য—প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ গঠন করা। বিরোধ শুধুমাত্র প্রক্রিয়ায় যা কিনা সংসদকে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করতে পারে। তথাকথিত জাতীয় নীতি ভারতীয় সংসদকে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করতে আঞ্চলিক নির্বাচনকেই পর্যাপ্ত এবং সঠিক মনে করেছে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যাপ্রাপ্ত নীতি বর্তমান ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কারণে কখন-ই ভাবতে পারে না যে আঞ্চলিক নির্বাচন ভারতীয় সংসদকে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব দিতে পারে। অতএব প্রশ্ন হল যে, আঞ্চলিক নির্বাচন কি প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব এনে দিতে পারে? এই প্রশ্নকে ঘিরেই এখন বিতর্ক।

পাশ্চাত্যদের কাছে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক-নীতির তুলনায় হিন্দুদের তথাকথিত জাতীয় নীতি অনেক বেশি কাছের। তার কারণ পাশ্চাত্যের মানুষ এলাকাভিত্তিক নির্বাচনের সঙ্গেই বেশি পরিচিত। কিন্তু এই তথাকথিত জাতীয় নীতি যে কতো অযোগ্য এবং এর উদ্দেশ্য যে সাম্প্রদায়িকতার থেকে জঘন্য, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

আঞ্চলিক নির্বাচনের নীতি পর্যাপ্ত এবং সঠিক নয়। কারণ এর অনেক কিছুই কল্লিত। এই কল্পনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১) এতে ধরে নেওয়া হয় যে, কোন অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার অঞ্চলের সকল মানুষের মতের-ই প্রতিনিধিত্ব করে।

২) সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেই সাধারণের মত বলে মেনে নেওয়াটাই যথেষ্ট। সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের সঙ্গে কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও নির্দিধায় উপেক্ষা করা যায়।

৩) নির্বাচিত প্রতিনিধি ভোটারদের স্বার্থ এবং ইচ্ছার প্রতিনিধি। সুতরাং তার নিজের শ্রেণীস্বার্থ কখন-ই ভোটারদের স্বার্থের থেকে বড় হয়ে উঠবে না।

এর প্রত্যেকটিই ভ্রান্ত ধারণা। কোনও তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা এগুলিকে সঙ্গত বলে মানতে নারাজ।

সংসদীয় সরকারের ইতিহাস এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাস এক-ই কথা বলে। এটা ভাবাই ভুল যে, সবসময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতোই সমাজের সকল শ্রেণীর মতো। বস্তুত তা কখনই সন্তোষজনক স্তরে পৌঁছায় না। নির্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের এবং মতের সচেতন আদান-প্রদান থাকলে তবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতিফলন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে চিন্তার ঐক্য, স্বার্থের ঐক্য ও বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ ধ্ব্যাস প্রায় বিরল সেখানে কোনও একটি ছোট বা বড় অংশের মতো অপর অংশের চাহিদাকে কখনই প্রকাশ করতে পারে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত যে শুধুই সংখ্যাগরিষ্ঠের, এ ভ্রান্ত ধারণা যখন সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করে, তখন এই অভিমত মেনে নেওয়া মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া।

অন্যদিকে, এটা মেনে নেওয়া ভুল যে, নির্বাচিত প্রতিনিধি নিজের শ্রেণী স্বার্থ ভুলে শুধুমাত্র ভোটারদের স্বার্থের কথাই ভাববে। জনপ্রতিনিধির অবস্থা আসলে দ্বিধাবিভক্ত অনুগতের মতো। সে একাধিক কর্তব্যের পরস্পরবিরোধী সংঘাতের সম্মুখীন:

- ১) নিজের প্রতি কর্তব্য।
- ২) নিজ শ্রেণীর প্রতি কর্তব্য।
- ৩) নির্বাচনকারী ভোটারদের প্রতি কর্তব্য।

প্রথমটি বাদ দিলে অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, প্রতিনিধি ভোটারদের থেকে নিজের শ্রেণীর স্বার্থই আগে দেখবে। তার থেকে অন্যরকম-ই বা আশা করি কি করে? জাগতিক নিয়মেই নির্বাচন ক্ষেত্রের থেকে নিজ সত্তা মানুষের অনেক কাছের। প্রচলিত একটি কথাই আছে যে, মানুষের চামড়া তার গায়ের জামার থেকেও কাছের। প্রায়শই দেখা যায় যে, জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিজের শ্রেণী বা জাত, নির্বাচনী কেন্দ্রের থেকে অনেক কাছের—চামড়া আর জামার মতো দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও। সকল রাজনৈতিক স্থপতি যখন অঞ্চল-ভিত্তিক নির্বাচনকে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন তখন হিন্দুরা দেশের রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে এর ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চাইছে। এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলিতেও এই রাজনৈতিক পদ্ধতিকে বহুকাল আগে

বর্জন করা হয়েছে। ইউরোপীয় বহু দেশেই এই পদ্ধতি ত্যাগ করে অন্য ধরনের সরকার গঠন করা হয়েছে। দেখা গেছে যে এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিত্ব, ভাল এবং যোগ্য সরকার গড়তে অক্ষম। যে সব দেশে এখনও এই প্রথা চালু আছে, সেখানে এই প্রথার ফল নিয়ে চরম অসন্তোষ বর্তমান। কর্ম এবং জীবিকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে ও গণভোট এবং ক্ষমতাচুক্তি সংক্রান্ত যে প্রস্তাবগুলি এসেছে, এ সবের পেছনে বহু প্রাজ্ঞ এবং শিক্ষিত মানুষের সায় আছে, যারা সবাই অঞ্চলভিত্তিক প্রথার বিরুদ্ধে।

অতএব এই পরিস্থিতিতে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সারা পৃথিবীতে সমালোচিত হয়েছে, হিন্দুরা কেন তা প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তা জানতে বড় কৌতূহল হয়। কারণ হিসাবে অবশ্য হিন্দুরা বলেছে যে, এই একটি মাত্র প্রক্রিয়াই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে পারে। তবে আমি এই ব্যাখ্যায় বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নই। আমার মনে হয়, আসল উদ্দেশ্য আলাদা। হিন্দুরা জানে যে, আসন-ভিত্তিক নির্বাচন হলেই তারা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারবে। হিন্দুরা ভালই জানে যে, শুধুমাত্র আসন-ভিত্তিক নির্বাচন হলে সেটা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও সংখ্যালঘু অচ্ছুৎদের মধ্যে।

সুতরাং হিন্দুরাই যে জয়ী হবে সেটা নিশ্চিত। উপরন্তু হিন্দুরা তাদের গরিষ্ঠতা জোরদার করতে নিতান্তই সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়া আরও অন্যান্য নির্ণায়কের ওপরেও নির্ভর করতে পারে। হিন্দু সমাজের অদ্ভুত চরিত্রের মধ্যেই সেই সব কারণগুলি অন্তর্নিহিত আছে। হিন্দু সমাজের জাতভেদের দরুন সমাজের শীর্ষের মানুষের সম্মান সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে নীচু জাতি চরম ঘৃণ্য বলে পরিগণিত হয়। এই সামাজিক রীতি যে নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে, তা বলাই বহুল্য। উচ্চবর্ণের কোনও হিন্দুই ঘৃণ্য অচ্ছুৎ প্রার্থীকে ভোট দেবে না। কারণ তারা ঘৃণ্য অচ্ছুৎদের সংসদের যোগ্য বলেই মনে নিতে পারবে না। অন্যদিকে কিন্তু অচ্ছুৎদের বহুলাংশই হিন্দু প্রার্থীকে ভোট দেবে। তার কারণ, অচ্ছুৎদের শেখানো হয়েছে যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু তার নিজের বা নিজের জাতের থেকে অনেক বেশি সম্মানীয়। এসব ছাড়াও নির্বাচনে গরীব, অশিক্ষিত ও অসংগঠিত অচ্ছুৎদের সমর্থন পাওয়ার আরও নানা কৌশল তো আছেই।

সুতরাং এই সবের মিলিত প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বই বাড়িয়ে তুলবে। অঞ্চল-ভিত্তিক নির্বাচনে হিন্দুদের জয়লাভ নিশ্চিত। অপরদিকে অচ্ছুৎদের সব কাটি আসনে পরাজয় নিশ্চিত। তারা হারতে বাধ্য। কারণ, প্রথমত তারা সংখ্যালঘু এবং

দ্বিতীয়ত হিন্দুরা সাফল্যের সঙ্গে অচ্ছুৎদের দুর্বলতা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে। এর ফলে অচ্ছুৎদের কাছে হিন্দুদের ভোট দেওয়া ঈশ্বরকে পূজা উৎসর্গ করার সামিল বলে তাদের মনে হবে। অতএব এইসব শক্তির নিরিখে বুঝা যায় যে, হিন্দুরা অঞ্চল-ভিত্তিক নির্বাচনে লাভবান হবে এবং অনায়াসেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারবে। অচ্ছুৎদের প্রস্তাবিত তথা কথিত সাম্প্রদায়িক নীতি মেনে নেওয়া হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাত থেকে বেরিয়ে অচ্ছুৎদের হাতে আসবে, এটা হিন্দুরা ভালই জানে। সুতরাং উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হলেও জাতীয় নীতির ফল যে সাম্প্রদায়িক নীতির চেয়েও মারাত্মক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

□ □ □

অধ্যায় ৫

যৌথ নির্বাচন বনাম পৃথক নির্বাচন

অনেক সংশয় কাটিয়ে উঠে হিন্দুরা অবশেষে মেনে নিয়েছে যে, শুধুমাত্র অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচন ভারতবর্ষের মতো দেশে অচল। তবে মনে হতে পারে যে, অঞ্চল ভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে এতক্ষণের বিতর্কের কোন প্রয়োজন ছিল না। বিদেশিদের কাছে যাতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপরেখা স্পষ্ট হয়, সে কারণেই আমি এই দুই বিতর্কিত মতের তুলনামূলক আলোচনা করলাম। দুর্ভাগ্য যে হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নীতিটি মেনে নিলেও অচ্ছুৎদের সমস্ত দাবিগুলিকে মেনে নেয় নি। অচ্ছুৎরা পৃথক ভোটদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে চেয়েছে। পৃথক ভোটদান অর্থাৎ শুধুমাত্র অচ্ছুৎরাই তাদেরই একজনকে নির্বাচিত প্রতিনিধি করে সংসদে পাঠাতে চেয়েছিল। হিন্দুরা মেনে নিয়েছে যে, অচ্ছুৎদের জন্য সংসদে কিছুসংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু হিন্দুরা বলছে যে, সেই আসনের প্রতিনিধিকে সাধারণ নির্বাচন লড়েই আসতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচন বনাম পৃথক ভোটদানের বিতর্ক রয়েই গেছে। এবারও আমি এই বিতর্কের সকল দিক খতিয়ে দেখতে চাই। হিন্দুরা আপত্তি জানিয়েছে যে, পৃথক নির্বাচন হলে জাতি বিভক্ত হবে। এই আপত্তির যোগ্য জবাবও আছে।

প্রথমত আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় জাতি নামে কোন জাতির অস্তিত্ব নেই। জাতি সৃষ্টি করতে হয়, তার অস্তিত্ব থাকে না। আমি মনে করি যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট ও পৃথক সম্প্রদায়কে অবদমন করে নতুন জাতি সৃষ্টি করা যায় না। এ-কথা হয়তো সকলেই মানবেন। দ্বিতীয়ত, এটা মানা হয়েছে যে, সংসদে অচ্ছুৎদের প্রতিনিধিত্ব করবে অচ্ছুৎরাই। সুতরাং অচ্ছুৎরাই যে অচ্ছুৎদের যথার্থ প্রতিনিধি, সেটা অস্বীকার করা যায় না। আবার সেটাই যদি সত্যি হয়, তাহলে অচ্ছুৎদের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব উঠে আসবে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে। এর বিরুদ্ধে হিন্দুদের যুক্তি অ-সমর্থনযোগ্য এবং অন্তঃসারশূন্য। অচ্ছুৎদের রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিকে হিন্দুরা মেনে নিয়েছে। পৃথক নির্বাচন এই ভিত্তির-ই যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। ভিত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে পরিণামকে আমরা কি করে অস্বীকার করি! সংখ্যালঘুদের সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ নির্বাচনী প্রক্রিয়া গঠন করা হয়। অচ্ছুৎদের নির্বাচন প্রয়োজন তা তাদের মতো সংখ্যালঘুদের-ই নির্ণয় করতে দেওয়া হবে না কেন?

অচ্ছুৎদের পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেওয়া হবে নাই বা কেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর হিন্দুদের কাছে নেই। জাতির দোহাই দিয়ে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করার পেছনে হিন্দুদের অন্য উদ্দেশ্য আছে। আসলে পৃথক নির্বাচন হলে অচ্ছুৎদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি হিন্দুরা কেড়ে নিতে পারবে না। অন্যদিকে সাধারণ নির্বাচন হলে সেটা সম্ভব। এই হল হিন্দুদের আপত্তির আসল কারণ। সাধারণ এবং পৃথক নির্বাচন কিভাবে নির্বাচন ক্ষেত্রে আসন বন্টন করে তা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করছি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কয়েকটি আসনকেই বেছে নেওয়া যাক :

সারণি-১

আসন	হিন্দুদের মোট আসন	অচ্ছুৎদের সংরক্ষিত	মোট হিন্দু ভোটার	মোট অচ্ছুৎ ভোটার	হিন্দু এবং অচ্ছুৎ ভোটারদের অনুপাত
১। মাদ্রাজ দক্ষিণ শহরতলি	২	১	৪০,৬২৬	২,৫৭৭	১৬:১
২। চিকাকোল	২	১	৮৩,৪৫৬	৫,১২৫	১৬:১
৩। বিজয়নগরম্	২	১	৪৭,৫৯৪	৯৯৬	৪৯:১
৪। অমলাপুরম্	১	১	৫২,৮০৫	৭,৭৬০	৭:১
৫। এলোর	১	১	৫১,৭৯৫	৫,১৫৫	৯:১
৬। বান্দার	১	১	৮৪,১৯১	৮,৭২৩	১০:১
৭। তেনালি	২	১	১,৩২,১০৭	৫,৭৩২	২৪:১

এই সারণিতে আসনের পরিসংখ্যান থেকে ভোটের চিত্রটা পরিষ্কার। যে কোনও মানুষের কাছেই এটা পরিষ্কার যে, এই সাতটি নির্বাচনী আসনে পৃথক নির্বাচন হলে অচ্ছুৎরা অনায়াসেই তাদের আত্মস্বাধীন কোনও প্রতিনিধি সংসদে পাঠাতে পারত হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। আবার অন্যদিকে, যদি যৌথ নির্বাচন হত তাহলে অচ্ছুৎদের প্রতিনিধি শুধু নামেই প্রতিনিধি হতেন। বাস্তবে হিন্দুদের মুখাপেক্ষী হয়েই তাকে জিততে হত, কারণ হিন্দু এবং অচ্ছুৎ ভোটারের অনুপাত কোথাও ২৪:১ আবার কোথাও ৪৯:১। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনে জিতলেও সেই প্রতিনিধি কখনও যথার্থ অচ্ছুৎদের প্রতিনিধি হতে পারেন না। আসলে সাধারণ

নির্বাচনে হিন্দুরাই নামমাত্র প্রতিনিধি করে কোনও একজন অচ্ছুৎকে নির্বাচিত করেছে। এই প্রতিনিধি আসলে হিন্দুদের হাতে কলের পুতুল। এর থেকে আরও পরিষ্কার যে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক নীতির বিরোধিতা করে তাদের প্রবর্তিত তথাকথিত জাতীয় নীতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে হিন্দুরা কোনও জাতি বা আদর্শের জন্য লড়ছে না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থের জন্যই লড়ছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই প্রথমেই নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতার কোন অংশীদার রাখতে তারা রাজি নয়। ঠিক যেন হিন্দু যৌথ পরিবারের একক সুবিধাভোগী নায়েব মশাই। সেইজন্য অঞ্চল-ভিত্তিক নির্বাচন-ই হিন্দুদের পছন্দ। এতে কাজ না হলে দ্বিতীয় পছাও হিন্দুদের কজায়। ক্ষমতার ভাগ দিতে হলেও তার ওপর আধিপত্য করবে হিন্দুরাই। আর যৌথ নির্বাচন হলে তা তো হবেই। এই জন্যেই হিন্দুরা পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করে যৌথ নির্বাচনের পক্ষে এত সরব।

ফলে জাতীয় নীতির উদ্দেশ্য আপাত দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক না হলেও কার্যত এর পরিণতি তাই।



অধ্যায় ৬

নির্বাহিক

দ্বিতীয় রাজনৈতিক দাবি অনুযায়ী অচ্ছুৎরা সংসদ ছাড়াও নির্বাহি-কৃত্যকেও তাদের প্রতিনিধিকে চায়। এ দাবিরও হিন্দুরা বিরোধিতা করেছে। হিন্দুদের দুটি যুক্তি আছে এই বিরোধিতার পেছনে। এক : সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল-ই নির্বাহিক (Executive) গড়বে এবং দুই : নির্বাহিক (Executive) পদে আসীন লোকদের যোগ্য হতে হবে। আমি দ্বিতীয় যুক্তিটি নিয়েই প্রথমে বলতে চাই।

এটি সত্যিই একটি অকাট্য যুক্তি। তবে মনে রাখা দরকার যে, প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারে এই যুক্তি সুদূরপ্রসারী নয়। অধ্যাপক ডাইসি বলেছেন, ‘সাংবিধানিক রীতির প্রথমিক উদ্দেশ্য কখনই দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সংসদ গঠন করা নয়। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সংসদ গঠন করলে তা কখনই জন-প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের রূপ নেবে না।’

যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা ভিত্তিহীন। অচ্ছুৎ বলেই তাকে অশিক্ষিত মনে করতে হবে, এমন কথাও কেউ বলে নি। অচ্ছুৎদের যদি মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়, তবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং যোগ্য লোককেই যে তারা নির্বাচিত করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে এ-রকম যোগ্য লোকের অভাব নেই। তবে এই শর্ত শুধুমাত্র অচ্ছুৎদের ওপরেই আরোপিত করা কেন? অচ্ছুৎদের মতো মুসলমানরাও মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছে। কই, তাদের ওপর তো হিন্দুরা এ-রকম শর্ত আরোপ করে নি? এর থেকে বুঝা যায় যে, হিন্দুদের আপত্তির কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। এটা অজুহাত মাত্র।

এবার হিন্দুদের দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলি। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু শব্দ দুটির অপব্যবহার করেছে। তারা ভুলে গিয়েছে যে, এগুলি আসলে রাজনৈতিক শ্রেণী এবং সে জন্যেই সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কোনও কিছু নির্দিষ্ট করা যায় না। রাজনৈতিক সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। আজ যারা সংখ্যালঘু, কাল তারা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে এবং উল্টোটাও সত্যি হতে

পারে। হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের মধ্যে ব্যবধান কখনই এ-ধরনের নয়। রাজনৈতিক সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতো একে অপরের সাথে মিশে যাওয়ার প্রবণতা হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের নেই। এছাড়াও রাজনৈতিক সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরও একটি বৈশিষ্ট্য হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। রাজনৈতিক সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শুধুমাত্র দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ। হিন্দু আর অচ্ছুৎদের মতো তারা মৌলবাদী শক্তি দ্বারা পৃথকীকৃত নয়।

তৃতীয় আরও একটি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে যা হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক সংখ্যালঘু সংখ্যার দিক থেকে আরও হ্রাস পেতে থাকে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল গরিষ্ঠতা প্রাপ্তির সাথে সাথে সংখ্যালঘুদের মনোভাবের সাথে এতটাই একাত্ম হয়ে ওঠে যে সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে বিষয়-ভিত্তিক লড়াইয়ের পথ পরিহার করে। এ সমস্ত বিষয়-ই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অচ্ছুৎ সংখ্যালঘু সম্পর্কের কাছে বিজাতীয়। এদের নির্দিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এরা শুধুমাত্র আলাদাই নয়। একে অপরের প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে। এদের সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ আখ্যা দিয়ে কিছু বলা, জার্মানদের সংখ্যাগুরু ও ফরাসিদের সংখ্যালঘু বলার মতোই যেন আপাত বাস্তব ও সত্যি হতে পারে।

□ □ □

অধ্যায় ৭

জন-কৃত্যক

অচ্ছুৎদের দাবি, নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে দেশের সমস্ত সরকারি চাকরিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। হিন্দুরা অন্যান্য দাবির মতো অচ্ছুৎদের এ দাবিরও তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং চারিত্রিক গুণাবলী সরকারি পদে আসীন হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি। সে-ক্ষেত্রে জাতি বা ধর্ম বিবেচ্য নয়। চারিত্রিক গুণাবলী অবশ্যই প্রয়োজনীয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষমতা এবং যোগ্যতাও নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। এখন শুধু একটি বিষয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘিরেই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। আর তা হল, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ। শিক্ষাগত যোগ্যতাকেই সর্বোত্তম মেনে নিয়ে হিন্দুরা চাইছে যে, সব জাতি এবং ধর্মের মানুষকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি পদে বহাল করতে। তারা মনে করে এর ফলে যোগ্য লোক-ও পাওয়া যাবে এবং অচ্ছুৎরাও সরকারি চাকরির সুযোগ পাবে।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে যথার্থ মেনে নিয়ে হিন্দুরা অচ্ছুৎদের দাবির বিরোধিতার ন্যায় সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে চাইছে। এ-ক্ষেত্রেও মূল সমস্যা থেকে তাদের যুক্তি বহু দূরে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য লোক পাওয়া যাবে কি না এটা কিন্তু আলোচ্য বিষয় নয়। আসলে যেহেতু এই পরীক্ষা সকল জাতি এবং ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত, সেক্ষেত্রে অচ্ছুৎরা সরকারি চাকরিতে কতটা জায়গা পাবে সেটাই প্রশ্ন। এ সমস্তই নির্ভর করছে রাজ্যের শিক্ষা পদ্ধতির ওপর। সেটা কি খুব একটা গণতান্ত্রিক? শিক্ষার সুযোগ কি এতটাই ব্যাপ্ত? এই সুযোগ কি সকলে গ্রহণ করছেন, যাতে সকল জাতির এবং ধর্মের মানুষ-ই প্রতিযোগিতায় নামতে পারে? নইলে অনেক সমপ্রদায় প্রতিযোগিতার বাইরে থেকে যাবে। এই প্রাথমিক শর্তটাই ভারতবর্ষের শিক্ষার পরিকাঠামোয় অনুপস্থিত। ভারতে উচ্চশিক্ষার অধিকার একমাত্র হিন্দুদের, বিশেষত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। অস্পৃশ্যতার জন্যই অচ্ছুৎরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাদের দাবিদ্রের জন্যেই তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। সরকারি চাকরিতে উচ্চপদে আসীন হতে গেলে উচ্চশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সরকারি চাকরির গুরুত্বপূর্ণ পদে অচ্ছুৎরা পৌঁছতে পারলে তবেই তাদের

পক্ষে অনুকূল। উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা রাষ্ট্র বহন করবে না, যদিও অচ্ছুৎরা তাদের প্রস্তাবে এর জন্য দাবি জানিয়েছে। হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক হওয়ার দরুন অনুদানও দেবে না। সুতরাং অচ্ছুৎদের প্রত্যেকযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে সরকারি চাকরিতে আসতে বলা মানে তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ঠকিয়ে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে অচ্ছুৎরা যে দাবি জানাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। যোগ্যতা যে গুরুত্বপূর্ণ তা অচ্ছুৎরা জানে। সে কারণেই তারা নিজেরাই ন্যূনতম যোগ্যতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। তারা চাইছে যে, এক-ই পদের জন্য যদি হিন্দু এবং অচ্ছুৎ প্রার্থী আবেদন করে, তবে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে অচ্ছুৎ প্রার্থীকেই চাকরিতে বহাল করতে হবে যদিও হিন্দু প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অচ্ছুৎ প্রার্থীর থেকে বেশি থাকে। অবশ্য এই ব্যবস্থায় চাকরিতে ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ হবে। এই নিয়মটি শুনতে অদ্ভুত লাগলেও যোগ্যতার পরীক্ষা যে কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে সরকারি চাকরি পাওয়ার একচেটিয়া সুযোগ করে দেবে সেটা ভুলে গেলে চলবে না। অথচ ক্যাম্পবেল-ব্যানম্যান (Campbell-Banneman) কি বলেন নি যে ভাল সরকারের থেকে স্ব-শাসন অনেক ভাল? অচ্ছুৎরা কি এটাই চাইছে না? যোগ্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা তারা মেনে নিয়েছে। সেই জন্যেই তারা সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতার প্রস্তাব দিয়েছে। অচ্ছুৎরা যা চাইছে না, তা হল তাদের বাদ দিয়ে কোনও ভাল সরকার। শ্রেষ্ঠ যোগ্যতার ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হবে তা গঠন করবে হিন্দুরা। শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে ন্যূনতম যোগ্যতার দিক থেকে হিন্দুরা অনেক ধাপ এগিয়ে। সুতরাং সেই সরকার সাম্প্রদায়িক হবেই। অচ্ছুৎদের এখানেই ঘোরতর আপত্তি। তাদের বক্তব্য, ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিজেদের সরকার গঠন করা সম্ভব। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতাকেই বিবেচনা করতে হবে। এর মাধ্যমেই সম্পূর্ণ এবং যোগ্য সরকার গঠন করা সম্ভব।

অধ্যায় ৮

পৃথক ভূ-বাসন

পূর্বে উল্লিখিত চতুর্থ প্রস্তাবটি খুব-ই সুস্পষ্ট ভাবে তার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছে বলেই আমি মনে করি। এই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝবারও খুব প্রয়োজন নেই। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। পৃথক ভূ-বাসনের (Settlement) দাবিকে বলা যেতে পারে অচ্ছুৎদের ‘নবজীবন আন্দোলনের’ ফল। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, হিন্দুদের কবল থেকে অচ্ছুৎদের মুক্ত করা। তবে যতদিন এই সমাজ-ব্যবস্থা থাকবে ততদিন হিন্দুদের এবং তাদের অস্পৃশ্যতার হাত থেকে অচ্ছুৎরা মুক্তি পাবে না। এক-ই জায়গায় থাকার ফলে হিন্দুদের এবং অচ্ছুৎদের মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার, জন্যেই হিন্দুরা অচ্ছুৎদের অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করতে পেরেছে। ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান দেশ হওয়ার দরুন এই সমস্যা আরও জোরালো হয়েছে। গ্রামীন সমাজ-ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত অচ্ছুৎরা সহজেই চিহ্নিত হবে এবং সেই কারণে অস্পৃশ্যতার হাত থেকেও তারা রেহাই পাবে না। এই প্রথা বন্ধ করার জন্যই অচ্ছুৎরা দাবি জানিয়েছে যে, তাদের আঞ্চলিক এবং ভৌগোলিক ভাবেও পৃথক করে দেওয়া হোক। তারা এমনটিই সামাজিক বৈষম্যের শিকার। সুতরাং জাত-পাতের কবলমুক্ত পৃথক গ্রামেই অচ্ছুৎরা বসবাস শুরু করতে চায়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক কারণের জন্যেও অচ্ছুৎরা পৃথক ভূ-বাসন গড়তে চাইছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা যে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া শ্রেণী তা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে না। অচ্ছুৎরা ভূমিহীন মজুরের দল, যারা জীবিকা এবং রোজগারের জন্য সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের ওপর নির্ভরশীল। হিন্দুদের অস্পৃশ্যতার মনোভাবের জন্য তারা তাদের পছন্দ ও সুবিধা মতো জীবিকা বেছে নিতে পারে না। ইচ্ছেমতো জীবিকা বেছে নিলে হিন্দুরা অচ্ছুৎদের একঘরে করে রাখে। সুতরাং হিন্দুদের ওপর নির্ভর করে গ্রামে থাকলে তারা কোনদিন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে না। দারিদ্র্য, দুর্দশা ছাড়াও হিন্দুদের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার জন্য অচ্ছুৎদের আরও নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। হিন্দুদের জীবনযাপন তাদের ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এই ধরনের জীবনযাপন হিন্দুদের নানারকম সুবিধাভোগী করে তুলে

অচ্ছুৎদের জীবনকে আরও অসম্মানের করে তোলে। ‘নবজীবন আন্দোলনে’র মাধ্যমে অচ্ছুৎরা ধর্মের নামে হিন্দুদের যে অত্যাচার ও নিপীড়ন করে চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। প্রত্যেক গ্রামেই হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের এই লড়াই চলছে। এই বিরামহীন লড়াইয়ের জনসমক্ষে প্রকাশ পায় না। হিন্দু সংবাদপত্রে এ-সবের খবর থাকে না। এই খবর ছাপলে হিন্দুদের স্বাধীনতা আন্দোলন পৃথিবীর চোখে হয়ে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু এই যুদ্ধ এক কঠিন বাস্তব সত্য, এ লড়াই হয়ে চলেছে নীরবে। গ্রামের সমাজ-ব্যবস্থার জন্যেই অচ্ছুৎরা স-সম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিদিন সমাজের অধিক বিত্তশালী ও প্রতাপশালী হিন্দুদের সঙ্গে গরীব প্রতিপত্তিহীন অচ্ছুৎরা সংগ্রাম করে চলেছে। হিন্দুরা অবশ্য নানান কারণে অচ্ছুৎদের অপদস্ত করতে পারে। পুলিশ এবং জেলা-শাসক (Magistrate) হিন্দুদের হাতে। অচ্ছুৎ এবং হিন্দুদের মধ্যে কোনও বিবাদ হলে অচ্ছুৎরা পুলিশের সাহায্য বা জজ সাহেবের সুবিচার কোনটাই পায় না। পুলিশ এবং জজ — উভয়েই হিন্দু। তারা তাদের কর্তব্যের চেয়ে তাদের জাতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। এ সর্বের ওপর অর্থনৈতিক শক্তিই হিন্দুদের অনেক বড় শক্তি।’ অবদমিত শ্রেণীদের অভিযোগ তদন্ত করে দেখার জন্য ১৯২৮ সালে বোম্বাই সরকার একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রতিবেদনে দেখা যাবে, হিন্দুরা কিভাবে অর্থনৈতিক মারপ্যাঁচে অচ্ছুৎদের সমতার লড়াইকে খর্ব করে চলেছে। এই প্রতিবেদন পড়লে বিদেশিরাও, যাঁরা ভারতীয় হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাঁরাও পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, হিন্দুরা কি জঘন্য অত্যাচার ও পীড়ন অচ্ছুৎদের ওপর করে চলেছে। সেই প্রতিবেদনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল। কমিটি জানাচ্ছে :

‘অবদমিত শ্রেণীরা যাতে সমস্ত রকমের নাগরিক সুযোগ সুবিধার অধিকার পায় তা সুনিশ্চিত করতে আমরা নানা প্রস্তাব করেছি। তবে আমাদের আশঙ্কা, সে অধিকার প্রয়োগ করতে তাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। তাদের প্রথম প্রতিকূলতা গৌড়া হিন্দুদের প্রকাশ্য হিংসাত্মক আচরণ। প্রত্যেক গ্রামেই অবদমিতরা অতন্ত সংখ্যালঘু। সমান অধিকারের দিকে অবদমিতদের সামান্যতম আগ্রাসনও গৌড়া হিন্দুরা নিজেদের সম্মান এবং স্বার্থের রক্ষায় যে কোনও মূল্যে প্রতিহত করবে। অবশ্য হিংসাত্মক আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা ও পুলিশি ব্যবস্থার জন্য এ ধরনের ঘটনা এখন বিরল।’

১. ‘ভারত শাসন আইন’ (১৯৩৫) হওয়ার আগে পর্যন্ত অচ্ছুৎদের অবদমিত শ্রেণী নামে অভিহিত করা হত। এই আইনের পর তাদের তফসিলি জাতি বলা হয়।

‘অবদমিতদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের অসুবিধার দ্বিতীয় কারণ। জেলা সদরের অধিকাংশ জায়গায় অবদমিতদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নেই। এদের অনেকেই গৌড়া হিন্দুদের আজ্ঞাবহ প্রজা হয়ে জমি চাষ করে, কেউ বা চাষের জমিতে দিন মজুরি করে। বাকিরা হিন্দুদের ফাইফরমাস খেটে যা চাল-ডাল পায়, তাই নিয়ে জীবন-ধারণ করে। আমরা অজস্র ঘটনা শুনেছি, যেখানে হিন্দুরা তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে গ্রামের অবদমিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে। অবদমিতরা তাদের অধিকার অনুযায়ী সামান্য কিছু করতে চাইলেই গৌড়া হিন্দুরা তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, কাজ দেওয়া বন্ধ করেছে, বা রোজগার কেড়ে নিয়েছে। সমাজে তাদের একঘরে করে সাধারণের চলার রাস্তা দিয়ে তাদের যাতায়াত বন্ধ করেছে অথবা গ্রামের মুদিখানার দোকান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দিতে নিষেধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সামান্যতম কারণেও অবদমিতদের একঘরে করে দেয় হিন্দুরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাতকুয়ো থেকে অবদমিত শ্রেণীর কোনও মানুষ জল নিলে হিন্দুরা এই দুঃসাহসের জন্য তাদের একঘরে করে রাখার বিধান দিত। তবে এ-ছাড়াও দেখা যায় যে, কোনও অবদমিত শ্রেণীর লোক পৈতে নিলে, জমি কিনলে, ভাল জামা কাপড় গয়না পরলে বা বিয়ের পর বর-বউকে ঘোড়ায় করে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়ার মতো তুচ্ছ কারণেও হিন্দুরা অবদমিতদের একঘরে করে দেয়।’

পৃথক ভূ-বাসনের নতুন দাবি অচ্ছুৎরা এই প্রথমবার করল। এতে হিন্দুদের কি প্রতিক্রিয়া হবে, তা বলা যায় না। তবে আমার মনে হয়, যাই হোক না কেন এরকম একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দাবি থেকে অচ্ছুৎরা কখনই সরে আসবে না। হিন্দুরা তাদের আর অচ্ছুৎদের পারস্পরিক সম্পর্কে বাইবেলে উল্লিখিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মতোই মনে করে। তারা মনে করে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তারা সম্পর্কযুক্ত এবং স্বয়ং ঈশ্বর যাদের এক করেছেন, কোনও মানুষ যেন তাদের পৃথক না করে। অচ্ছুৎরা এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর। হিন্দুদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে তারা আলাদা হয়ে যেতে চায়।

সময় এবং অর্থের প্রশ্নই এখন প্রধান। অচ্ছুৎরা বলছে, সরকার তাদের এই ভূ-বাসন গঠনের খরচ দিক। সে ক্ষেত্রে তার দায় হিন্দুদের ওপরেই বেশি পড়বে। তবে হিন্দুদের সেই দায় না নেওয়ারও কোন কারণ নেই। সব-ই তো হিন্দুদের। এ দেশের জমির মালিক তারা। ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের কজায়, রাষ্ট্রও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন।

রাজস্ব এবং লাভের সমস্ত উৎস তাদের দখলে। অন্য সম্প্রদায়রা, বিশেষ করে অচ্ছুৎরা, শুধুমাত্র কাঠ কাটে এবং জল তোলে। সামাজিক ব্যবস্থা হিন্দুদের একক আধিপত্য বিস্তার করতে সাহায্য করে। তাই এই দেশের বাস্তবে মালিক যখন তারাই, তখন তাদেরকেই এই প্রকল্পের ব্যয় বহন করতে বলাটা অযৌক্তিক নয়।

নতুন ভূ-বাসন গড়তে যদি কুড়ি বছরও লাগে, তবুও হাজার বছরের বন্দী ক্রীতদাসরা সানন্দে আরও কুড়ি বছর অপেক্ষা করবে মুক্তির স্বাদ পেতে।

□ □ □

অধ্যায় ৯

সংবিধান এবং জাত-পাত

নিশ্চয়-ই প্রশ্ন করা যেতে পারে, অচ্ছুৎদের দাবিগুলি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কেন? পৃথিবীর অন্য কোথাও সংবিধান প্রস্তুতকারকদের ওপর এ ধরনের চাপ আসে নি। আমি চাই যারা এই দাবি তুলেছেন তারাই এর সংগত প্রশ্নের উত্তর দিন, এবং সেই উত্তর সাংবিধানিক দিক থেকে যে যথার্থ তা প্রতিষ্ঠা করুন। আমার কাছে অবশ্য উত্তরটা পরিষ্কার। ভারতীয় সমাজের চরিত্রের মধ্যেই এই দাবিকে সাংবিধানিক করার কারণ নিহিত আছে। হিন্দুদের জাত-প্রথা ও ধর্মান্দর্শ এর জন্যে দায়ী। তবে এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে হিন্দু ধর্ম এবং জাত-পাতের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত বিদেশিদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট হবে না। তবে একথাও সত্যি যে, এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংবিধানের ওপর জাত-প্রথার প্রতিক্রিয়া বিশদভাবে আলোচনা করা যাবে না। এ বিষয়ে বিশদভাবে জানতে আগ্রহী হলে আমার গ্রন্থ জাতপ্রথার বিলোপ (Annihilation of Castes) পড়তে পারেন। আমার বিশ্বাস, উক্ত বইটিতে জাত ও ধর্মের বিধি অনুযায়ী হিন্দুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিস্তার ভালভাবেই জানতে পারবেন। এই প্রবন্ধে অবশ্য আমি কতগুলি সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরব। সংবিধান তৈরি করতে গেলে সমাজের গঠনকে সবসময় মনে রাখতে হয়। রাজনৈতিক কাঠামোকে সবসময় সমাজের গঠনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। সামাজিক শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে। এই তর্কাতীত দৃষ্টিভঙ্গিই অচ্ছুৎরা পোষণ করে। হিন্দুরাও একথা জানে এবং এর শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তারা কখনই স্বীকার করে না যে, হিন্দু সমাজের গঠন ইউরোপীয় সমাজের গঠনের থেকে ভিন্ন। তারা মনে করে, হিন্দুদের জাত-প্রথার সাথে ইউরোপীয়দের শ্রেণীপ্রথার কোনও প্রভেদ নেই। এ ধারণা অবশ্যই ভ্রান্ত এবং এই ধারণায় জাত-প্রথা এবং শ্রেণী-প্রথা সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রকাশ পায়। জাত-প্রথা বিচ্ছিন্নতা-ভিত্তিক এবং এই বিচ্ছিন্নতার ভাবনাকে পূর্ণ পবিত্রতা বা গুণ হিসাবে দেখা হয়। শ্রেণী-প্রথাতেও প্রভেদ বা বিচ্ছিন্নতা আছে তবে তা কখন-ই পূর্ণ পবিত্রতা বা গুণ হিসাবে দেখা হয় না। এই সমাজে সামাজিক আদান-প্রদানও নিষিদ্ধ নয়।

তবে এটা সত্যি যে শ্রেণী-প্রথা গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। কিন্তু-তা জাতগত গোষ্ঠীর মতো নয়। শ্রেণী-প্রথার গোষ্ঠী শুধুমাত্র সমাজ বিমুখ কিন্তু জাত-প্রথার বিভিন্ন গোষ্ঠী পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই সমাজবিরোধী আচরণে আক্রান্ত। এই বিশ্লেষণ যদি সত্যি হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে, হিন্দুদের সমাজের গঠন আলাদা এবং সে কারণে রাজনৈতিক পরিকাঠামো আলাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসলে সহজভাবে বলতে গেলে, অচ্ছুৎরা তাদের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে আচরণের একটা সামঞ্জস্য চাইছে। লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকতে পারে। কিন্তু তা বলে এই নয় যে, লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি এক হবে। পরিণতি এক হলেও সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য। পরিণতির বা লক্ষ্যপূরণের প্রতি যারা নির্বাচনে, তারা নিশ্চয় মানবেন যে, লক্ষ্য পৌছতে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেই হয়, যদি না তারা মনে করেন যে তাদের আসলে বোকা বানানো হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি যে, হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখে উপযুক্ত ভাবে গঠন করা দরকার। অনেকেই এটা মেনে নিচ্ছেন কিন্তু এক-ই সঙ্গে বলছেন যে, জাত-প্রথা হিন্দু সামাজ্য থেকে তুলে দেওয়া সম্ভব। আমি কিন্তু একমত নই। যারা এ-কথা বলছেন, তারা মনে করেন যে জাত-প্রথা আসলে ক্লাব, পুরসভা বা পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠান। এটা একটা মারাত্মক ভুল। জাত হচ্ছে ধর্ম এবং ধর্ম কখন-ই প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। ধর্মকে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধরে রাখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ধারক প্রতিষ্ঠান আর ধর্ম এক নয়। ধর্ম একটা প্রভাব বা শক্তি, যা প্রত্যেক মানুষের চরিত্র, আচার-আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। এই আচার-আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ প্রতিষ্ঠানের মতো বাতিল করা যাবে। এগুলি হল শক্তি বা প্রভাব যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়, নয়তো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সামাজিক শক্তি রাজনীতিকে কলুষিত এবং বিকৃত করে কিছু মানুষকে ক্ষমতার শিখরে এবং অধিকাংশ মানুষকে দুর্দশার অতলে নিয়ে যায়। এই অবস্থা প্রতিরোধ করতে হলে রাজনৈতিক পরিকাঠামোকে এমন করতে হবে, যাতে ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল হয়ে অবিচার দূর হয়।

এতক্ষণ অবধি আমি হিন্দু সমাজের অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিকাঠামো, সংবিধান প্রস্তুতকর্তাদের দায়িত্ব এবং অন্য দেশের সঙ্গে পার্থক্য সাধারণভাবে আলোচনা করলাম। এবারে আমি নির্দিষ্টভাবে ভারতীয় সংবিধানে সাম্প্রদায়িক নীতির উপস্থিতি ও সরকারি চাকরিতে অচ্ছুৎদের জন্যে নির্দিষ্ট সংরক্ষণ

নিয়ে আলোচনা করব। এসব দাবির যৌক্তিকতা সহজেই অনুমেয়। অত্যাবশ্যকীয় নয়, এমন কোনও বস্তু নিয়ে বিবাদের জেরেই যে হিন্দুরা এবং অচ্ছুৎরা আলাদা—এ-কথা কখনোই ঠিক নয়। অচ্ছুৎদের দাবির যুক্তির উৎস এখানেই। মৌলবাদী বিরুদ্ধাচরণ এবং তীব্র ঘৃণাই হিন্দু আর অচ্ছুৎদের আলাদা করে রেখেছে। এর জন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। অস্পৃশ্যতার অস্তিত্বই হিন্দু এবং অচ্ছুৎদের বিরুদ্ধাচরণের যথেষ্ট প্রমাণ। এই তীব্র বিরোধিতার কথা মনে রেখে এটা কখনই ভাবা যায় না যে, স্বাধীন ভারতে অচ্ছুৎরা হিন্দুদের ভরসা করে সুবিচার পেতে পারেন। অচ্ছুৎরা বলছেন, তারা হিন্দুদের বিশ্বাস করবে না। একথা যে ঠিক নয় তা কে বলতে পারে? হিন্দুরা তাদের কাছে ইউরোপীয়দের মতো ভিনদেশি হলেও নিরপেক্ষ নয় বরং নির্লজ্জের মতো তাদের স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত এবং অচ্ছুৎদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ তাদের মধ্যে বর্তমান। সন্দেহ নেই যে, এতকাল ধরে হিন্দুরা অচ্ছুৎদের ঘৃণা, অশ্রদ্ধা করে তাদের ভিন্ন কোনও জাত বা সমাজের জঘন্য কোন স্তরের বলে মনে করে এসেছে। হিন্দুরা তাদের আচরণে প্রকাশ করে থাকে, যেন তারাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণী। হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কার কখন-ই অচ্ছুৎদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিচার করার সুযোগ দেয় নি। অচ্ছুৎদের সঙ্গে কোনও রকম সামাজিক আদান-প্রদান তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে তারা ভাবে। সুতরাং অচ্ছুৎরা এ ধরনের মানুষের ওপর তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য কেন ভরসা করবে? কি করে বৈধভাবে অচ্ছুৎদের বলা হবে, তাদের স্বার্থ সেই সব মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে, যারা নিজেদের স্বার্থে এবং লক্ষ্যে অচ্ছুৎদের বিরোধী? যারা অচ্ছুৎদের মনোভাবের সমব্যথী নয়, যারা নিজেদের প্রয়োজনের প্রতি একনিষ্ঠ নয়, যারা তাদের ইচ্ছার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, যারা নিশ্চিতভাবে পক্ষপাতের মাধ্যমে অচ্ছুৎদের সুবিচার থেকে বঞ্চিত করবে, এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে নির্লজ্জভাবে অচ্ছুৎদের ওপর যে কোনও ধরনের অমানুষিক কাজ করতে পারে, তাদের কিভাবে বিশ্বাস করা যাবে? একমাত্র রাজনৈতিক অধিকার-ই অচ্ছুৎদের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সে কারণেই তারা সংবিধানে তাদের দাবির উল্লেখ রেখে অধিকার চাইছে। তাদের সুরক্ষার জন্য তারা কি খুব বেশি কিছু চাইছে?

অধ্যায় ১০

হিন্দু এবং তাদের বন্ধুদের কাছে কিছু প্রশ্ন

এহেন রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুরা একে সম্প্রদায়ের প্রতি একে রকম আচরণ করছে। ভারতে অচ্ছুৎরা একাই রাজনৈতিক সুরক্ষা চাইছে না। হিন্দুদের কাছে মুসলমান এবং শিখরাও তাদের রাজনৈতিক দাবি জানিয়েছে। তবে এই দুই সম্প্রদায়কে কখন-ই অসহায় সংখ্যালঘু আখ্যা দেওয়া যায় না। বরঞ্চ এরা ভারতের দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়। এরা যথেষ্ট শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনেক উন্নত। সমাজেও এরা হিন্দুদের সম-আসনেই অধিষ্ঠিত। তাদের সংগঠন অনেক শক্তিশালী এবং হিন্দুরা এদের ক্ষতি করা দূরে থাক, তাদের অবহেলার চোখে দেখা বা কোনরকম ক্ষতি করার সাহস পায় না।

মুসলমান এবং শিখদের রাজনৈতিক দাবিগুলি কি? সেগুলি বলা অবশ্য এখানে সম্ভব না। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, এরা ভীষণ অবিবেচক ও উদ্ধত এবং হিন্দুরা এদের সম্বন্ধে ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করে। অন্যদিকে অচ্ছুৎদের অবস্থা এবং দাবি, শিখ এবং মুসলমানদের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। অচ্ছুৎরা অসমর্থ, অসহায় এবং ঘণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এরা সকলের দয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং প্রায়শই হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানদের যৌথ অত্যাচার এদের সহিতে হয়। অন্য সব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের থেকে এদের সবচেয়ে বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন। এদের দাবি ন্যূনতম সাধারণ এবং শিখ ও মুসলমানদের মতো অতিরিক্ত সুরক্ষার দাবিও এরা জানাচ্ছে না। কিন্তু এদের সকলের দাবির প্রতি হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া কি রকম? মাত্রাতিরিক্ত দাবির আতিশয্য সত্ত্বেও হিন্দুরা সর্বদা মুসলমান ও শিখদের, বিশেষ করে মুসলমানদের দাবির সমাধানে আগ্রহী। মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য হিন্দুরা অত্যন্ত বিবেচনার, এমনকি উদারতারও পরিচয় দিয়ে থাকে। শ্রী রাজা গোপালাচারির এই সেদিনের রাজনৈতিক কার্যফলাপকে আমরা নিশ্চয়-ই ভুলে যাই নি? হঠাৎ-ই কেন তিনি মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে বীর যোদ্ধার মতো নিজের জাতি এবং প্রাক্তন বন্ধুদের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন? তারা মুসলমানদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি পূরণ করল বলে? নাকি আলাদা পাকিস্তানের দাবি মেনে নিল বলে?

অচ্ছুৎদের দাবিগুলি সম্বন্ধে শ্রীরাজা গোপালাচারির মনোভাব কি? যতদূর আমি জানি, তিনি উত্তর দিতে অক্ষম। তিনি বোধহয় জানেনও না যে, ভারতের হয় কোটি অচ্ছুৎ মুসলমানদের রাজনৈতিক সুরক্ষার দাবি তুলেছে। আসলে শ্রীরাজা গোপালাচারির এই নীরবতা ও অনীহা সমগ্র হিন্দু জাতের মধ্যেই বিরাজমান। হিন্দুরা অচ্ছুৎদের দাবিকে হিংস্র কুকুরের একগুঁয়েমিতা ও স্বধর্মত্যাগীর মতো বিকৃত মানসিকতা নিয়ে বিরোধিতা করে চলেছে। সংবাদপত্র তাদের-ই হাতে এবং পত্রিকাগুলি নিয়মিত অচ্ছুৎদের অবজ্ঞা করে। যখন আর উপেক্ষা করতে পারে না, তখন অচ্ছুৎদের নেতাদের কিনে ফেলে। যখন কোনও নেতাকে কিনতেও পারে না, তখন তার নামে কুৎসা লিখে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, তাদের ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব সেই নেতাকে দাবিয়ে চূপ করিয়ে দেয়। অচ্ছুৎদের লড়াই করতে বন্ধপরিষদ কোনও নেতাকে আর তার সমর্থকদের রাষ্ট্র বিরোধী আখ্যা দিয়ে নিন্দা করা হয়। অচ্ছুৎদের দাবির কথা শুনে হিন্দুরা এতটাই জ্বলে ওঠে যে, রাগের মাথায় তারা মানতে চায় না যে, অচ্ছুৎরা কতগুলি রাজনৈতিক সুরক্ষার পরিবর্তে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা শাসিত হতে চেয়ে উদারতার-ই পরিচয় দিয়েছে। সংযুক্ত আয়ারল্যান্ড গঠনের ব্যাপারে মীমাংসা আলোচনার সময় কারসন্ রেডমণ্ডকে কি বলেছিলেন তা বোধহয় হিন্দুরা জানে না। ঘটনাটি মনে করিয়ে দিই। রেডমণ্ড কারসন্কে বলেন, ‘আলস্টারের প্রটেস্টান্ট সংখ্যালঘুদের জন্য আপনি যে কোনও সাংবিধানিক সুরক্ষা চান আমি দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আসুন আমরা এক-ই সংবিধানের আওতায় সংযুক্ত আয়ারল্যান্ড গড়ে তুলি।’ কারসন্ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও নির্মম উত্তর দিতে কালক্ষেপ করেন নি। কারসন্ বলেন, ‘চুলোয় যাক আপনার সুরক্ষা, আমি আপনার শাসনের অধীন থাকতে চাই না।’ অচ্ছুৎরা যে কারসন্দের মতো বলেনি, তার জন্য তাদের কাছে হিন্দুদের কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। তবে কৃতজ্ঞ থাকা তো দূরের কথা, তারা ক্রুদ্ধ, কারণ অচ্ছুৎরা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করছে। হিন্দুদের মতে, অচ্ছুৎদের অধিকার দাবি করার কোনও অধিকার-ই নেই। অন্য সম্প্রদায়ের ও এদের প্রতি আচরণের পার্থক্য কিসের ইঙ্গিতবাহী? তিনটি বিষয় সম্বন্ধে ইঙ্গিতে করে: (১) তারা সমস্ত ক্ষমতা নিজেরাই পেতে চায়, (২) ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তারা রাজনীতি করতে প্রস্তুত নয় (৩) ক্ষমতা সমর্পন করতে হলে হিন্দুরা নিষ্ঠুর ও বলীয়ান শক্তির কাছেই সমর্পন করবে কিন্তু কখনই ন্যায়কে মানবে না।

হিন্দুদের এই আচরণের জন্য ভারতীয় রাজনীতির করুণ দৃশ্যপট রচনা করেছে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই একমাত্র করুণ দৃশ্য নয়। আরও একটি করুণ দৃশ্য আছে। হিন্দুদের বিদেশি বন্ধুদের নিয়েই এই করুণ কাহিনী। যারা বিশ্বে,

বিশেষ করে, ‘মুক্তির দেশ’ আমেরিকাতে, চতুর প্রচারের মাধ্যমে অনেকের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছে। দুঃখের বিষয় হল, এইসব বন্ধুরা এমন পক্ষ সমর্থন করেছে, যা সুবিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখেই তারা হিন্দুদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছে। আমি যতদূর জানি, হিন্দুদের কোনও আমেরিকান বন্ধু আজ অবধি জানতে চায় নি হিন্দুরা কিসের জন্য লড়াই করেছে। তারা স্বাধীনতার জন্য না ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছে? হিন্দুরা যদি ক্ষমতার জন্য লড়াই করে, তাহলে তাদের সমর্থন করা কি আমেরিকান বন্ধুদের উচিত হচ্ছে? হিন্দুরা যদি স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তাহলে সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হবে না কেন? আমেরিকানরা অবশ্য এইটুকুই করতে পারে। হিন্দুদের সাহায্য করার জন্য আমেরিকানরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তখন তাদের জানানো দরকার যে, এই অন্ধ সমর্থন কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আমি হিন্দুদের যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় হিন্দুরা, কংগ্রেসের মধ্যে এবং বাইরে, ব্রিটিশদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিন ব্রিটিশদের বলা হয়েছিল যে, ‘তোমরা যদি আমাদের সাহায্য চাও তবে যুদ্ধের কারণ জানাও। তোমরা যদি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছ, তবে সেই স্বাধীনতা কি আমাদেরও দেবে?’ একটা সময় এসেছিল যখন এই যুদ্ধ স্বাধীনতার সহায়ক হবে বলে ব্রিটিশদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয়েছিল। এখন হিন্দুরা আরও একধাপ এগিয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিতে তারা সন্তুষ্ট নয়। কংগ্রেসি মুখপাত্রের কথায় : ‘দেওলিয়া হবার সম্ভাবনা আছে এজন্য কোন ব্যাংকের ভবিষ্যৎ তারিখের চেক নিতে আমরা রাজি নই।’ হিন্দুরা যুদ্ধের প্রয়াসকে সমর্থন করার আগেই স্বাধীনতা চেয়েছে। শ্রী গান্ধীর নতুন শ্লোগান ‘ভারত ছাড়া’ আন্দোলনের এটাই তাৎপর্য। মিঃ চার্লিল অবশ্য উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, এই যুদ্ধ শত্রুদের পরাজিত করার জন্য। হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয়নি। তারা জালতে চেয়েছিল, বিজয়ের পর আপনারা কি করবেন? যুদ্ধের পর কোন ধরনের সামাজিক-ব্যবস্থা আপনারা প্রতিষ্ঠা করতে চান? বিতর্কের ঝড় ওঠে যখন মিঃ চার্লিল বলেন যে, তিনি চান ঐতিহ্যময় ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠা। এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা খুব-ই সঙ্গত, তা মানি। কিন্তু হিন্দুদের বন্ধুরা কি ভেবে দেখেছেন, যে শ্রী চার্লিলকে জিজ্ঞাসা করা যদি বৈধ হয়, তবে এক-ই প্রশ্ন হিন্দুদের ও শ্রী গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করা বৈধ হবে না কেন? ব্রিটিশরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ গোষণা করেছেন। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য আছে। হিন্দুদেরও সাম্রাজ্য আছে। তাহলে হিন্দুধর্ম কি এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদ নয়, যে সাম্রাজ্যে শোষিত জাত অচ্ছুৎরা তাদের হিন্দু মালিকদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে চলেছে? চার্লিলকে যদি যুদ্ধের কারণ দর্শাতে

বলা হয়, তবে হিন্দুদের এবং শ্রী গান্ধীকেও কেন তা জিজ্ঞাসা করা যাবে না! উভয়েরই বক্তব্য যে, এই যুদ্ধ মুক্তির জন্য যুদ্ধ। তাই যদি হয়, তবে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য জানাতে বাধা কোথায়? ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের পর শ্রী গান্ধী কি করতে চান? স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কি অচ্ছুৎদেরও স্বাধীনতা দেবেন, না অচ্ছুৎদের ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য হিন্দুদের আরও ক্ষমতা দেবেন? হিন্দুরা এবং শ্রী গান্ধী কি নতুন সমাজ গড়বেন, নাকি পুনরায় হিন্দু ভারতবর্ষ স্থাপন করবেন? মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রী অস্বীকার করে অস্পৃশ্যতা আর জাত-পাতের হিন্দু-ভারতবর্ষ কি থেকে যাবে? আমি মনে করি, বন্ধু আমেরিকানদের শ্রী গান্ধী এবং হিন্দুদের কাছে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত?

এ প্রশ্ন অত্যন্ত বৈধ এবং সময়োচিত। এর উত্তর থেকেই আমেরিকান বন্ধুরা জানতে পারবেন যে, শ্রী গান্ধীর যুদ্ধ—স্বাধীনতার না ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ। প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। হিন্দুদের যারা জানে, তাদের কাছে কারটাও স্পষ্ট। হিন্দুদের রক্ষণশীলতা সহজাত এবং ভীষণ বদ্ধমূল। তাদের ধর্মের সাথে কখনই মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রী অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ধারণা মিশতে পারে না। একথা নিঃসন্দেহে অবশ্য বলা যায় যে, বিশ্বের সব জায়গাতেই অসাম্য বর্তমান। কিন্তু এই অসাম্য পরিস্থিতির কারণে সেখানে ধর্মের কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা।

হিন্দু সমাজেই শুধু নয়, হিন্দু ধর্মের বিধানের অসাম্য বিরাজ করে। হিন্দুদের সাম্যের প্রতি কোনও আগ্রহই নেই। গণতান্ত্রিক মতে প্রত্যেক মানুষের যে সমান মূল্য, এ ধারণার বিরোধিতা হিন্দুদের আচরণেই পরিস্ফুট। প্রত্যেক হিন্দুই সামাজিক ভাবে রক্ষণশীল এবং রাজনৈতিক ভাবে বিপ্লবী মনোবাবাপন্ন। শ্রী গান্ধীও এই গণ্ডির বাইরে নন। আশ্বেদের কাছে নিজেকে অত্যন্ত উদার বলে দাবি করলেও তার উদারতা জুতোয় জমে থাকা ধুলোর মতোই হাল্কা আন্তরণ মাত্র। সেই আন্তরণ হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে যে, শ্রী গান্ধী একজন অভিজাত রক্ষণশীল। অভিশপ্ত এক জাতের তিনি প্রতিনিধি। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মকেই তুলে ধরেন সব ক্ষেত্রে। দেখুন, হিন্দুরা কি রকম ১৭৭৬ সালের আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে উল্লসিত হয়—যখন এই ঘোষণায় বলা হয়—

‘যখন-ই কোনও রকমের সরকার এই সবার ক্ষতি সাধন করবে, মানুষ নিজের অধিকারে তা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের সুখ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী কোনও ক্ষমতাকে সংগঠিত করে নতুন সরকার গঠনে প্রয়াসী হতে পারবে।’

হিন্দুরা এখানেই থেমে যায়। তারা এই ঘোষণার আগের অংশে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে ভাবে না। সেখানে কথা হয়েছে—

‘আমরা প্রমাণিত সত্য বলে মানি যে, সব মানুষ-ই সমান সৃষ্ট, সৃষ্টি কর্তা তাদের সবাইকে কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার দিয়েছেন। যেমন জীবন, মুক্তি এবং সুখের সন্ধান করা। এই সব অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য শাসিতদের মত নিয়ে মানুষের সমাজে সরকার গঠিত হয়।’

এই ঘোষণাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক করুণ অধ্যায় রচিত হয়েছে। এই ঘোষণা সম্বন্ধে দু’রকম মত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, এটি মহৎ আধ্যাত্মিক দলিল। অন্যেরা বলেন যে, এতে অনেক অসত্যকে অমর করে রাখা হয়েছে।

অবশ্য মানব মুক্তির এই সনদ নিগ্রোদের জন্য প্রযোজ্য হয় নি। এখন দেখতে হবে যে, এই ঘোষণার মূলে কোন বিশ্বাস রয়েছে। এই ঘোষণার লেখক জেফারসনের বিশ্বাস অবশ্য সন্দেহের অতীত। একটি দীর্ঘ নীতির বিবৃতি দিতে গিয়ে তার দেশ একটা সংক্ষিপ্ত পথ বেছে নেয়। তিনি অবশ্য মর্মান্বিত হয়ে লিখেছিলেন—‘আমার দেশবাসীর জন্য আমি দুঃখিত।’

এতে নিগ্রোদের কোনও ক্ষতি পূরণ হয়নি। কিন্তু সে দেশের বিবেক এখনও মরে যায়নি এবং ন্যায়ের ধ্বজা একদিন নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হবে। নিগ্রোরা হয়তো এটা শুনে হাসবেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছ থেকে এই সান্ত্বনাও অচ্ছুৎরা পায় না। আজকাল লোকেরা হিন্দুদের সংগঠিত গোষ্ঠি দেখে গর্ববোধ করে। কিন্তু তারা অবাক হতে পারেন যে, এটা আমেরিকায় ‘সলিড সাউথ’ যেমন নিগ্রোদের কাছে ভীতিপ্রদ, ভারতের অচ্ছুৎদের কাছেও তা সে রকম-ই ভীতিপ্রদ। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে জেফারসনের মতো লজ্জিত ও মর্মান্বিত মানুষ কই? আমি ভেবেছিলাম, অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক নিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বাধীনতা চাইতে হিন্দুরা লজ্জাবোধ করবে। তাদের কাছে অস্পৃশ্যতা সামাজিক অন্যায্যও নয়, নৈতিক পাপও নয়। তাদের বিবেক নেই। তাদের ন্যায়বোধও নেই। অথচ তারা স্বাধীনতাকামী এবং দুঃখের বিষয়, তারা সমর্থনও পেয়ে যায়। তাদের কাছে অস্পৃশ্যতা ক্রিকেট বা হকির মতো কোনও খেলা। শ্রী গান্ধীর বন্ধুরা অবশ্যই তাঁকে এবং তাঁর কাজের দিকে চোখ ফেরাতে বলবেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের সংস্কারের জন্য তিনি কি করেছেন? গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ কি তাঁর জীবনকে আশা ও ভরসার নিদর্শন রূপে দেখবেন? তাঁর বন্ধুরা ‘হরিজন সেবক সংঘের’ কথা জানেন। তাই তারা বলেন—‘শ্রী গান্ধী

কি হরিজনদের উন্নতির জন্য কাজ করছেন না?’ সত্যিই কি তাই? ‘হরিজন সেবক সংঘের’ উদ্দেশ্য কি? এই সংঘ কি? এই সংঘ কি অচ্ছুৎদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে হিন্দু প্রভুদের সমান অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়ার পথে কাজ করছে? শ্রী গান্ধীর এরকম কোনও উদ্দেশ্য কখনই ছিল না। তিনি চানও না এবং আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতেও চাইবেন না। একজন প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিপ্লবীর পক্ষেই এই উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। শ্রী গান্ধী এই দুইয়ের কোনটাই নন। তিনি বিশ্বাসে এবং জন্মসূত্রে একজন রক্ষণশীল।

অচ্ছুৎদের জন্য কাজ করে তাদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য কিন্তু ‘হরিজন সেবক সংঘের’ নয়। প্রত্যেক সচেতন অচ্ছুৎ জানে যে, এর আসল উদ্দেশ্য হিন্দু এবং হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষে সুরক্ষিত করা। শ্রী গান্ধী কখনই অচ্ছুৎদের লড়াই লড়ছেন না। অন্যদিকে এই সংঘের মাধ্যমে ছিটে-ফোঁটা বদান্যতা দেখিয়ে তিনি তুচ্ছ অচ্ছুৎদের কিনে ফেলছেন। এইভাবে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শিথিল করে দিচ্ছেন। তিনি জানেন যে, প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকলে অচ্ছুৎরা জাত-প্রথা তুলে দিতে পারে এবং ভারতে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শ্রী গান্ধী কিন্তু মনে প্রাণে চান, যাতে এদেশ থেকে জাত-প্রথা উঠে না যায়। তিনি আবার এও চান যে, অচ্ছুৎরা হিন্দুদের মতো এ দেশে থাকুক। কিন্তু কি ভাবে তারা থাকবে? বন্ধু হিসাবে না দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়ে? শ্রী গান্ধী অচ্ছুৎদের প্রতি সদয়। কিন্তু কিসের জন্য? করুণা ছড়িয়ে তাদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নতার এবং স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চান তিনি। নানান কৌশলের মধ্যে অন্যতম এই ‘হরিজন সেবক সংঘ’ শ্রী গান্ধীকে একজন সফল দমবাজ (humbug) হতে সাহায্য করেছে।

এবার পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর দিকে তাকানো যাক। তিনি জেফারসনের ঘোষণা থেকে অনুপ্রাণিত হন। কিন্তু কখনও কি তিনি ছয় কোটি অচ্ছুতের দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন? কখনও কি তার কলম নিসৃত সাহিত্যের ফল্গুধারায় তাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে? আপনি যদি চান, একবার ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের কাছে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এদের ছড়াছড়ি। পণ্ডিতের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এরা সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু হিন্দুদের এই সব ধর্মী দলালরা কি অচ্ছুৎদের প্রতি তাদের পূর্বজদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছে? রাজনীতির শ্রোতে গা ভাসাচ্ছে হাজার হাজার যুবক। কিন্তু একজনকেও আপনি পাবেন না যে জাত-প্রথা বা অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য গর্জে উঠেছে। হিন্দু মানসিকতায় গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক জীবন, গণতান্ত্রিক নীতিতে ন্যায়বান ও বিবেকবান হওয়া যেন ধাতের

নেই। গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে এই ধরণের রক্ষাশীলদের হাতে তুলে দিলে গণতান্ত্রিক মানুষরা বিরাট ভুল করবেন। অতএব আমেরিকান বন্ধুরা, এখন-ই শ্রী গান্ধীকে এবং হিন্দুদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, হিন্দুরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সত্যিই স্বাধীনতার যুদ্ধ করছেন কি না। কংগ্রেস এবং হিন্দুরা অবশ্য সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবগুলি বিদেশি বন্ধুদের কাছে তুলে ধরবেন। কিন্তু আমেরিকান বন্ধুরা সাবধান। এই প্রস্তাবগুলির বাইরের চাকচিক্যে আপনারা যেন বিভ্রান্ত না হন। সংখ্যালঘুদের অধিকার ঘোষণা করা আর সেগুলির বাস্তবে রূপদান করার মধ্যে পার্থক্য আছে। হিন্দুদের বন্ধুরা সেই সব অধিকার সরাসরি বাস্তবায়িত করার জন্য চাপ দেবেন না কেন? হিন্দুরা কি ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতার আশ্বাস পেয়েই নিশ্চিত থাকবে বলছে? তারাও কি এই মুহূর্তে স্বাধীনতা চায় না? তারা যদি ব্রিটিশদের কাছে সংগ্রামের লক্ষ্য পূরণের কথা বলে, তবে তারা নিজেরাই বা কেন তাদের লড়াইয়ের লক্ষ্য পূরণের কথা ঘোষণা করবে না? আমেরিকান বন্ধুরা, আমি নিশ্চিত যে আপনারা হিন্দুদের 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ'—এই বিভ্রান্তিকর প্রচারে বিশ্বাস রাখবেন না।

হিন্দুদের সাহায্য করার আগে ভেবে নিই যে, স্বাধীনতার নামে আপনারা অচ্ছুতদের মতো লক্ষাধিক ভারতীয়ের স্বাধীনতা ধ্বংসকারীদের সাহায্য করছেন না তো? ভারতের ছয় কোটি অচ্ছুতের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছে এই আবেদন রাখছি। আমেরিকান বন্ধুরা যেন ভাববেন না যে, ভারতীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ সংবিধানে ভারসাম্য রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটা মানুষের স্বাধীনতার লড়াই। মুক্তিকামী গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ যেন জন অ্যাডামস্-এর কথা ভুলে না যায়—'ইতিহাসে প্রতিটি পাতাকে আমরা স্মরণ করতে পারি, যখন দেখি স্বেচ্ছাচারী মানুষ, নির্মম, বর্বর বা নিষ্ঠুর কোনও রাজা বা সীমাহীন ক্ষমতাবান কোনও সংসদ—যারা নির্দিষ্টায় চিরকাল গরিষ্ঠতার ফলে সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।'

সংখ্যাগুরুদের যদি সুনিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মধ্যে রাখতে হয়, তাহলে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা সার্থক করার কাজটা যে কত ব্যাপক, ভেবে দেখবেন?

পরিশিষ্ট বিষয়ে

বর্তমান খণ্ডটি ১৯৪৫ সালের ‘কংগ্রেস এবং গান্ধী অচ্ছুৎদের জন্য যা করেছেন’ গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। ১৯৪৬ সালে ডাঃ আশ্বদকর-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিষয়গত পরিমার্জন ও সংযোজন লক্ষ্যনীয়। অধ্যায় ১০-এ এই পরিবর্তনগুলি থাকার ফলে পরিশিষ্ট হিসাবে তা এই খণ্ডে সংযোজন করা হল। অন্যান্য পরিচ্ছেদে আর কোনও পরিবর্তন নেই।

নাগপুর নিবাসী শ্রী জি. পি. মানগভকর মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়গুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অধ্যায় ১১

বিদেশিদের কাছে একটি আবেদন

'Let not Tyranny Have freedom to Enslave'

(‘অচ্যুচাচারী না পায় যেন ক্রীতদাস বানাবার স্বাধীনতা’)

১

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, ভারতীয় রাজনীতিতে আগ্রহী বেশিরভাগ বিদেশিরা কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করে। এই আচরণে স্বাভাবিকভাবেই অন্য রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষুব্ধ হয়। অন্য দলগুলির মধ্যে প্রধানত মুসলিম লীগ, জাস্টিস পার্টি এবং অল-ইন্ডিয়া সিডিউলড কাস্টস্ ফেডারেশন বিদেশিদের এই আচরণে ক্ষুব্ধ। মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে বলে দাবি করে। জাস্টিস পার্টি যদিও দাবি করে, তারা ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র, তবুও বর্তমানে তারা, খুব একটা সক্রিয় নয়। অল-ইন্ডিয়া সিডিউলড কাস্টস্ ফেডারেশন দাবি করে তারা অচ্ছুৎদের প্রতিনিধি। এরা সকলেই বিদেশিদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো সত্ত্বেও কেউ-ই সহানুভূতির সঙ্গে এদের কথা শুনতে চায় নি। বিদেশিরা এ-ধরনের আচরণ করেই বা কেন? সাধারণত এই আচরণের জন্য দুটি কারণ আছে বলে ভাবা হয়। প্রথমত, বিদেশিরা মনে করে, কংগ্রেস-ই ভারতীয়দের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যারা ভারতবর্ষ এবং অচ্ছুৎদের হয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু এই ধারণা কি সত্যি?

তবে এটা মানতেই হবে যে, এই ধারণা তৈরির পেছনে কিছু ঘটনা আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে, ভারতীয় সংবাদপত্র। ভারতের সংবাদপত্রগুলি কংগ্রেসের দোসর। তারা বিশ্বাস করে যে, কংগ্রেস কখনও ভুল করতে পারে না এবং কংগ্রেসের ভাবমূর্ত্তি ও নীতির পরিপন্থী কোনও খবর এরা কখনই ছাপে না। আর বিদেশিদের কাছে সংবাদপত্র-ই হচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক খবর জানার একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং এই যদি ভারতীয় সংবাদপত্রের চরিত্র হয়, তবে তারা কংগ্রেসকেই অচ্ছুৎ সহ সকল ভারতীয়ের একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে জানবে নাই বা কেন! এই অপপ্রচার দিনের পর দিন প্রতিবাদ ছাড়াই প্রচারিত হয়েছে, কারণ

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অচ্ছুৎদের হয়ে কোনও প্রচার চালানো হয় নি।

অচ্ছুৎদের কোনও সংবাদপত্র নেই। কংগ্রেসি কাগজগুলি কংগ্রেসের খুব-ই ঘনিষ্ঠ এবং অচ্ছুৎদের বিন্দুমাত্র প্রচার না করতে বন্ধপরিবর। অচ্ছুৎরা নিজেদের কোনও কাগজ চালাতেও পারবে না। আসলে কোন কাগজ-ই বিজ্ঞাপন ছাড়া চলতে পারে না। বিজ্ঞাপনের টাকা আসে ব্যবসায়ী মহল থেকে। ভারতে সব রকম ব্যবসা, ছোট কিংবা বড়, সব-ই কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত। এই সব ব্যবসায়ীরা কখন-ই অ-কংগ্রেসি কোনও সংগঠনকে সাহায্য করবে না। ভারতের প্রধান সংবাদ সংস্থা 'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের' (AP) সব কর্মচারী মাদ্রাজি ব্রাহ্মণ। ভারতের সব কাগজ-ই আসলে তাদের হাতে এবং সে কারণে তারা ভীষণভাবে কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন এবং তাই কংগ্রেস বিরোধী কোনও খবরকেই তারা প্রচার করবে না। এ-সব ব্যাপারে তো অচ্ছুৎদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

অচ্ছুৎরা যে তাদের স্বপক্ষে প্রচার চালায় না তার একটা বড় কারণ, তাদের প্রচার করার ইচ্ছে নেই। এই অনিচ্ছার পেছনে রয়েছে তাদের প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম। তারা এমন কিছু করতে চায় না, যাতে বিশ্বের মানুষের চোখে ভারতের সম্মানহানি হয়। ভারতীয় রাজনীতির দুটি নির্দিষ্ট রূপ আছে—বৈদেশিক রাজনীতি ও সাংবিধানিক রাজনীতি।

ভারতের বৈদেশিক রাজনীতি অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের থেকে মুক্তি এবং সাংবিধানিক রাজনীতি যা, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের চরিত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। যারা পৃথকভাবে চর্চা করতে ভালবাসেন, তাদের চোখে অবশ্য দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু অচ্ছুৎদের আশঙ্কা যে, যদিও বিক্রয় দুটি আলাদা, তবুও যাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। তারা কখনোই এই বিষয় দুটিকে আলাদা ভাবতে পারবে না। বরং সাংবিধানিক রাজনীতি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, তাকে ভারতের বৈদেশিক রাজনীতির বিতর্ক বলে তারা ভাবতে পারেন। এই কারণেই অচ্ছুৎরা নীরব থেকে কংগ্রেসের প্রচারের বিরোধিতা করতে চায় না।

কংগ্রেসিদের বিরুদ্ধে প্রচার সত্ত্বেও, অচ্ছুৎরা দেশপ্রেমিক মনোভাবের জন্যই যে নীরব থাকেন—সেই দেশপ্রেমকে কংগ্রেস স্বীকার করে না। অতএব কংগ্রেস যে অচ্ছুৎ সহ সকলের প্রতিনিধি, জনমনে এই বিশ্বাসের জন্য বস্তুত অচ্ছুৎদের নীরবতা এবং বিরোধিতা করার অনীহা সম্পূর্ণ দায়ী।

তবে এতক্ষণ যে ধারনাকে নিয়ে আলোচনা করলাম, তা যে সব সময় সত্যি

তা নয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরিসংখ্যান থেকেই তা স্পষ্ট। কংগ্রেস যে, সব শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি নয়, অচ্ছুৎদের তো নয়-ই, তা এই গ্রন্থের আগের অংশে তুলে ধরেছি। যে কোনও বিদেশি মানুষ তা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে বাস্তবের সঙ্গে প্রচারের কতটা ফারাক।’

আগে এক সময়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের পরীক্ষা নেওয়া হত না, তখন প্রচারের স্রোতে বিদেশিদের ভেসে যাওয়াকে না হয় মার্জনা করা যেত। কিন্তু এই পরীক্ষা ১৯৩৭ সালের নির্বাচনেই হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল দেখে আশাকরি বিদেশি বন্ধুরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবেন। এই ফলাফল থেকে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, কংগ্রেস কখনই অচ্ছুৎ সহ সকলের প্রতিনিধি নয়। এবং অন্য দলগুলিও ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি। সুতরাং তাদের বক্তব্যও শোনা উচিত।

II

কংগ্রেসের পেছনে বিদেশি সমর্থনের আরও একটা কারণ আছে। কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলির কর্মসূচির মধ্যে একটা বিরাট ফারাক আছে। বিদেশিরা তুলনা করতে গিয়ে দেখে যে, কংগ্রেস সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশি সরকারের আইন ভঙ্গ, কর বর্জন আন্দোলন সংগঠিত করা, কারাবরণ, আইন অমান্য, সরকারি দফতর বা পদ প্রত্যাখ্যান করা, ইত্যাদি। এ-সব দেখে মনে হয়, যেন কংগ্রেসিরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। অন্যদিকে বিদেশিরা দেখে যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দল তুলনামূলকভাবে নিষ্পৃহ এবং সংগ্রামের অংশীদার নয়। এর থেকে তাদের মনে হয় যে, অন্যান্য দল বাধা না দিলেও তারা নিরপত্তাপ এবং কংগ্রেসে-ই একমাত্র দল, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। স্বাধীনতা প্রেমিক সকল বিদেশি তাই কংগ্রেসকেই সমর্থন করতে বাধ্য হয়।

অত্যন্ত স্বাভাবিক এই সমর্থন। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। কংগ্রেসের দিকে এই পক্ষপাত কি আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি এক ধরনের বিমুগ্ধতা, না কোনও দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সংগ্রাম ভারতের মানুষকে স্বাধীনতা এনে দেবে? এই সমর্থন যদি কোনও বিমুগ্ধতার কারণে হয় তবে আমার কিছু বলার নেই। এই বইয়ের অধ্যায় ৭-য়ে অচ্ছুৎরা কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সঙ্গে নেই, তা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি বিদেশি বন্ধুরা তার দ্বারা প্রভাবিত

না হয়ে থাকেন, তাহলে আমি সত্যিই তাঁদের বুঝাতে বিফল হয়েছি। আমি অবশ্য কারও সাথে বাকযুদ্ধে নামতে চাই না। তবে ঐ অধ্যায় পড়ে অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত হতে পারেন কারণ যদিও সেখানে অচ্ছুৎদের কংগ্রেসের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ না নেওয়ার পেছনে যুক্তি অত্যন্ত প্রবল, তবুও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশীদার কোনও দল সমর্থনযোগ্য নয়—এমন কোনও যুক্তি আমি দেখাই নি।

তবে যদি কেউ পরবর্তী ধারনাটি পোষণ করেন, তবে তার চিন্তার ভারসাম্য পরীক্ষা করে ত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত করা উচিত। এমন অনেক মানুষ দেখা যায়, যিনি নিজের সব কথা না বলে, নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ না করেও তার প্রতি সন্দেহভাজনদের সাহায্য পাবার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করেন। সাধারণত এমন মানুষের কথাকে কেউ বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এই কথাটি ভীষণভাবে প্রযোজ্য। অধ্যায় ৭-য়ে আমি দেখিয়েছি যে, কংগ্রেস তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কোনও রূপরেখা এখনও অবধি প্রকাশ করেনি। কি ধরনের গণতন্ত্র তারা চায়।

ভারতে নিম্ন শ্রেণীর, বিশেষ করে অচ্ছুৎদের, কি অবস্থান হবে সেই গণতন্ত্রে, সব-ই অজানা। বারংবার অচ্ছুৎ সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দাবি জানানো সত্ত্বেও তারা তা প্রকাশ করে নি। এই অদ্ভুত অবস্থায় কংগ্রেস সত্যিই গণতন্ত্রের পক্ষে কি না, বুঝা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও বিদেশিরা তাদের বিশ্বাস করে সমর্থন করছে, এ সত্যিই আশ্চর্যের।

কংগ্রেস ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপন করতে চায় এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। স্বাধীন সংগ্রামে অংশ নিলেই তা প্রমাণিত হয় না। কোন সিদ্ধান্ত আমার আগে বিদেশিদের উচিত কংগ্রেসকে জিজ্ঞাসা করা যে, তারা কাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে? কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে ভাবার চেয়ে, কাদের জন্য স্বাধীনতার লড়াই চালাচ্ছে ভাবাটাই অনেক জরুরি। এ সম্বন্ধে তথ্য এবং সত্য না জেনে কংগ্রেসকে সমর্থন করাটা যে কোনও মুক্তিপ্রেমী মানুষের ভুল হবে। কিন্তু কংগ্রেসকে যে সব বিদেশি সমর্থন করছে, তারা এ-সব প্রশ্নকে কোনও ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। স্বাভাবিক ভাবে তারা যদি এসব প্রশ্ন তুলত তবে, জানতে পারত গণতন্ত্র নয় বরং প্রাচীন হিন্দু শাসন-নীতি, যেখানে বংশ পরম্পরায় শাসক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীকে শাসন করে চলবে, তেমন শাসন-ই কংগ্রেস আসলে পুনরায় স্থাপন করতে চায়।

শোষিত শ্রেণীর এবং বিশেষ করে অচ্ছুৎদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিদেশিদের চিন্তা ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মানসিকতার ওপর

নির্ভরশীল। তবুও কোনও দল-ই এদের চিন্তা ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারে না। অচ্ছুৎদের প্রতিনিধির উচিত নজরদারি করা এবং বিদেশিদের বুঝানো যে, কংগ্রেসকে সমর্থন করাটা ভুল।

III

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ছাড়াও, বিদেশিদের কংগ্রেস প্রীতির আসল কারণটা অন্য। সাধারণভাবে বিদেশিরা স্বাধীনতা, স্বশাসন এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকদের লেখা বা রাষ্ট্রনীতির গ্রন্থ থেকেই একটা ধারণা গড়ে তোলে।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁরা একটা দেশের স্বাধীনতা এবং অপর দেশের মানুষের স্বাধীনতার পার্থক্য অনুভব করে না। তাঁদের কাছে দুই-ই সমান। তাঁদের কাছে দেশ স্বাধীন মানে দেশবাসীও স্বাধীন।

সায়ন্ত শাসন বলতে মনে করে, তারা মানুষকে শুধু সাংবিধানিক নৈতিকতার ধারণা গড়ে তুলতে হবে। গ্রোট^১ এই অভ্যাস সম্বন্ধে বলেছেন : ‘সাংবিধানিক প্রতি অসীম শ্রদ্ধা, স্বাধীন শর্ত প্রকাশের অভ্যাস গড়ে তোলা সহ সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অন্তর্গত সকল কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য বলবৎ করা, নির্দিষ্ট আইনের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আচরণের অভ্যাস, কর্তৃপক্ষের সকল জনমুখি কাজের মুক্ত সমালোচনা, সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রতি সকল নাগরিকের আস্থা, দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তিক্ততা মেনে নেওয়া এবং তা সত্ত্বেও সাংবিধানিক পরিকাঠামোর প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির শ্রদ্ধা অটুট থাকবে।’ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতিবিদরা মনে করেন যে, কোনও জনগোষ্ঠীতে এই সকল অভ্যাস থাকলেই সায়ন্ত-শাসন সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

তাঁরা মনে করেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের বিশ্বজনীন ভোটাধিকার থাকলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্যান্য পদ্ধতিও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। যেমন—শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারণের সম্ভাবনা, গণভোট এবং ঘন ঘন নির্বাচন করা। কিছু কিছু দেশে এই সব পদ্ধতি জারি করাও হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এবং পুনঃ পুনঃ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট।

আমি দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি যে, এই সব ধারণা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং ত্রুটিপূর্ণ।

কোনও একটি দেশের স্বাধীনতা এবং দেশের মানুষের স্বাধীনতাকে এক করে দেখা মানে নিজেকে শুধু বিভ্রান্ত করা নয়, প্রতারণা করাও বটে। আসলে সমাজ, জাতি এবং দেশ—এ-সব হল নিরবয়ব এবং বহুমাত্রিক ব্যাঞ্জনাময় শব্দমালা। অস্বীকার করা যায় না যে, ‘জাতি’ শব্দটি একটি হলেও তার অর্থ হল বিভিন্ন শ্রেণীর সমষ্টি। দার্শনিক বিচারে হয়তো জাতিকে একক হিসাবে ধরা যেতে পারে কিন্তু সমাজতত্ত্বের বিচারে কখন-ই নয়। সমাজতত্ত্বে জাতি অর্থাৎ বহু শ্রেণীর সমষ্টি এবং জাতির প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে শোষিত শ্রেণীর, স্বাধীনতা নিশ্চিত ভাবে সুরক্ষিত থাকা। সংবিধানসম্মত সরকারের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নৈতিকতার প্রয়োজন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু এই সরকারকে টিকিয়ে রাখা আর সায়ত্ব-শাসন কখন-ই এক নয়। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার শাসনের পরিবর্তে জনগণের সরকার গঠন করতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন কখনই সম্ভব নয়। পশ্চিম ইউরোপের সংসদীয় গণতন্ত্রের করুণ পরিণতির কথা সবার জানা। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে; এই পদ্ধতি নিশ্চিতরূপে ভ্রমাত্মক।^১ পশ্চিম ইউরোপে গণতন্ত্রের পতনের কারণ নিয়ে অন্য জায়গায় প্রদত্ত আমারই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার উদ্ধৃত করছি—

‘মনুষ্য সমাজের প্রশাসনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মনুষ্য সমাজ স্বৈচ্ছাচারি শাসনকর্তাদের হাতে স্বৈরতন্ত্রের শিকার হয়েছিল। বহুকাল পরে অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মনে হয়েছিল যে, এটাই প্রশাসনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। আশা করা হত যে এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের মুক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার পাবে এবং সুখ ও সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা করতে পারবে। এ-সব উচ্ছ্বাসের অবশ্য কারণ ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে সাংসদরা জনগণের মত প্রকাশ করতে পারে এবং প্রশাসন সংসদের নির্দেশ মানতে বাধ্য। সংসদ এবং প্রশাসনের ওপরে রয়েছে আদালত ও উভয়-ই আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য জনগণের-ই

১. লেবার অ্যান্ড পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি—দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের শিক্ষা শিবিরে ১৯৪৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত ভাষণ।

সরকার তাই জনচিণ্ডজয়ী হয় এমন সব সম্ভাবনা এই পদ্ধতিতে রয়েছে। সুতরাং খুব-ই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে, এক শতাব্দী যেতে না যেতেই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। বিদ্রোহ দেখা যায় ইতালি, জার্মানি, রাশিয়া, ও স্পেন সহ কিছু দেশে। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সন্তোষজনক অবস্থায় জারি রয়েছে। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষের কারণ কি? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ভারতবর্ষ বোধ হয় সবচেয়ে প্রথম দেশ, যেখানে এই প্রশ্ন এই মুহূর্তে আলোচিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের দিকে এগোচ্ছে। এই মুহূর্তে এমন এক সাহসী কণ্ঠের প্রয়োজন, যে কণ্ঠ ভারতবাসীদের সাবধান করে দিয়ে বলবে : ‘সাবধান, সংসদীয় গণতন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মনে হলেও শ্রেষ্ঠতম নয়।’

সংসদীয় গণতন্ত্রের বিফলতার কারণ কি? স্বৈরাচারীদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র অত্যন্ত ধীর গতিতে কাজ করেছে। এই পদ্ধতি দ্রুত রূপায়ণে বাধা দেয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদে আইন পাশ না হলে প্রশাসনিক কাজ বাধা প্রাপ্ত হয়। আবার কখনও পাশ হওয়া আইন আদালতের রায়ে বে-আইনি বলে পরিগণিত হয়। ইতালি, স্পেন, এবং জার্মানি একনায়কত্বকে বরণ করে নেয়। তাই সেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য একনায়কত্ব বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল বলে গণতন্ত্রের পতন হয়। শুধুমাত্র একনায়করা যদি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করত, তাহলে কিছুই হত না। উল্টে এতে প্রমাণিত হত যে, সংসদীয় গণতন্ত্র একনায়কত্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, একনায়কত্বের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও দেশে গণতন্ত্র মানুষকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে নি। আরও দুর্ভাগ্যের যে, সংসদীয় গণতন্ত্র এক জায়গায় থেমে থাকে নি। তিনটি অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। শুরুতেই হল সকলের ভোটাধিকারের ফলে রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য। আবার খুব অল্পসংখ্যক গণতান্ত্রিক দেশ আছে, যেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার নেই। রাজনৈতিক অধিকারের ঐক্য থেকে জন্ম নিয়েছে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগের ঐক্য। এই ব্যবস্থায় প্রমাণিত হয়েছে যে, আইন দ্বারা গঠিত সমস্ত সংগঠন সমাজবিরোধী রূপ নেওয়ার ফলে রাজ্যের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ সমস্ত কিছুর জন্য গণতন্ত্রের শপথ নেওয়া দেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তীব্র স্কোভ ও বিরোধিতা গড়ে উঠেছে। এই সব দেশের অসন্তোষের কারণ একনায়কতান্ত্রিক দেশগুলির থেকে ভিন্ন। বিশদ আলোচনা করার সময় নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই সব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষ মুক্তি, সম্পদ, সমৃদ্ধি বা সুখের সন্ধান পায় নি। তাই যদি সত্যি হয়, তবে বিফলতার

কারণগুলি অবশ্যই খতিয়ে দেখা উচিত। আমার মনে হয়, মতবাদে ভুল বা সাংগঠনিক ভুল কিংবা উভয়ের জন্যেই সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

ব্রাস্ত মতবাদের মধ্যে ‘চুক্তি’র স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে সংসদীয় গণতন্ত্রের পতনের কারণ। মুক্তির নামে এই মতবাদকে অনেক বড় করে দেখা হয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে কখনই খেয়াল রাখা হয়নি যে, অর্থনৈতিকভাবে বিষম দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির ফলে ক্ষমতার ক্ষেত্রেও বৈষম্য দেখা দিয়েছে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দুর্বলকে প্রবঞ্চিত করলেও তা উপেক্ষিত হয়েছে। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রে মুক্তির ধ্বজা ওড়ে নি বরং দরিদ্র এবং অসহায়দের ওপর অর্থনৈতিক অবিচার হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় ভুল হল, যে রাজনৈতিক গণতন্ত্র কখনোই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া সার্থক হয় না—এইটি বুঝতে না পারা। অনেকে হয়তো এই ব্যাখ্যা নাও মানতে পারেন। তবে তাদের কাছে আমি জানতে চাই যে, ইতালি, রাশিয়া এবং জার্মানিতে সংসদীয় গণতন্ত্র কিভাবে এত সহজে ভেঙ্গে পড়ল? ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অত সহজে ভাঙল না কেন? আমার মনে হয়, উত্তর একটাই। ইংল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যদেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি অর্থনৈতিক এবং সামাজিক গণতন্ত্র ছিল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদ, যা সূক্ষ্ম তত্ত্বের মতো সুগ্রথিত। এটা যত মজবুত হবে, শরীর ও দেহ তত শক্তিশালী হবে। সাম্যের অপর নাম গণতন্ত্র। সংসদীয় গণতন্ত্র তথাকথিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মেতে ওঠায় প্রকৃত সাম্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে নি। সাম্য ও মুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার সামান্য প্রয়াসও তারা করে নি। তার ফলে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সাম্যের চেতনাকে গ্রাস করে গণতন্ত্রকে নিতান্তই একটি নাম এবং প্রহসনে পরিণত করেছে। উল্লিখিত এইসব ব্রাস্ত মতবাদ ছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ সংগঠনও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সমস্ত রাজনৈতিক সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়—শাসক এবং শাসিত। এটি মারাত্মক বিভাজন। এই বিভাজন যদি এখানেই থেমে থাকত তাহলে কিছু ক্ষতি হত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এই বিভাজনে চিরকাল শাসক দল থেকেই শাসক উঠে আসে এবং শাসিতরা চিরকাল শাসিত থেকে যায়। কখনই শাসিতরা শাসক হতে পারে না। এর কারণ, সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারে না যে, তারা নিজেদের শাসন করে। তারা সরকার গঠন করার পর সব কিছু সরকারের ওপরেই ছেড়ে দেয়। এর থেকেই বুঝা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্র কেন প্রকৃত অর্থে জনগণের নয় এবং বংশ পরম্পরায় এই ব্যবস্থায় শাসক শ্রেণী এবং শাসিত শ্রেণী একই থেকে যায়। রাজনীতির এই ক্ষতিকর গঠন-ই সংসদীয় গণতন্ত্রে

নিষ্ফলতার কারণ। এর ফলে মানুষ তার প্রতিশ্রুত মুক্তি' থেকে বঞ্চিত হল, সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন ধুলিস্যাৎ হল।'

যদি এই বিশ্লেষণ ঠিক হয়, তবে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের কিছু মৌলিক এবং প্রাথমিক বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। চিন্তার সুবিধার্থে বিষয়গুলিকে পর পর সাজিয়ে দিলাম।

(১)—ইতিহাসের কঠিন বাস্তব থেকে মানতে হবে, প্রত্যেক দেশে দুটি শ্রেণী বর্তমান—শাসক শ্রেণী এবং শোষিত শ্রেণী, যাদের মধ্যে সবসময় ক্ষমতার লড়াই চলছে।

(২)—সম্মান এবং ক্ষমতার বলে শাসক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর ওপর সহজেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

(৩)—প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার এবং বার বার নির্বাচন শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে পারবে না।

(৪)—হীনমন্যতার জন্যে শাসিত শ্রেণী শাসক শ্রেণীকে স্বাভাবিক নেতা ভেবে নিজেরাই তাদের নির্বাচিত করে।

(৫)—শাসক শ্রেণীর হাতে শাসন ক্ষমতা থাকলে গণতন্ত্র এবং স্বশাসনের কোনও বাস্তবায়ন হয় না।

(৬)—শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র বা স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরং শাসক শ্রেণী শাসন করার জন্যে ক্ষমতা হারালে তখন-ই তা বাস্তবায়িত হয়।

(৭)—কিছু দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা অনেক সময় শাসিত শ্রেণী শাসক শ্রেণীর পতন ঘটালেও অন্যান্য দেশে তাদের উৎখাত করতে আরও অন্যান্য শক্তির বা অধিকারের প্রয়োজন হতে পারে।

সকল গণতন্ত্র প্রেমী মানুষ যে এই বিষয়গুলিতে দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করবেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এই বিষয় তাকে ভাবতে সাহায্য করবে যে, গণতন্ত্রের জন্যে সংবিধান রচনা করতে গেলে মাথায় রাখতে হবে, সংবিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য শাসক শ্রেণীকে অবস্থানচ্যুত করা এবং চিরকালীন শাসনের বোঁক প্রতিরোধ করা। যুক্তিহীন

মতবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি করা যায় না; শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে গেলে গণতান্ত্রিক সরকারের পরিচালন কাঠামো অভিন্ন হতে পারে না; এবং পরিচালন ব্যবস্থার অসাম্য শুধু মহৎ করলেই হবে না, মেনে নিতেও হবে। কারণ শাসক শ্রেণী যে শোষিত শ্রেণীর ক্ষমতা কেড়ে নেয় তা একেক দেশে একেক রকম প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে।

এই হল গণতন্ত্রের সার কথা। দুর্ভাগ্যবশত পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতির লেখকরা বিদেশিদের ধ্যান-ধারণার উৎস হলেও তারা এ ধরনের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। তারা শুধুমাত্র গণতন্ত্রের একটা আপাত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সাংবিধানিক নৈতিকতা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং বার বার নির্বাচনকেই গণতন্ত্রের শেষ কথা এবং সার কথা বলেই উল্লেখ করেছেন।

যারা মনে করেন যে, গণতন্ত্রের ধারণার জন্য এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট, তারা সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই শাসক শ্রেণীর পক্ষে কথা বলছেন। অভিজ্ঞতা থেকে শাসক শ্রেণীরা জানে যে, এসব কৌশল তাদের ক্ষমতার ভিত নড়াতে অক্ষম। বরং এসব কৌশলের ফলে তাদের সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে এবং শোষিত শ্রেণীর বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করেছে।

যারা মনে করেন যে, গণতন্ত্র এবং স্বশাসন শুধুমাত্র গঠন না হয়ে স্বাভাবিক ভাবে আপন গতিতে এলেই ভাল, তারা ভেবে দেখবেন যে, চিরস্থায়ী কোনও শাসক দল গণতন্ত্রে সবচেয়ে বড় বিপদ। গণতন্ত্রে মানিয়ে চলাই হল সব থেকে নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত পন্থা। স্বাধীন গণতন্ত্রে সবার অধিকার থাকবে কিনা ভাবার আগে এই বিপদের অস্তিত্বের কথাটা চিন্তা করা প্রয়োজন। আমার মতে বিদেশিরা কংগ্রেসকে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে কিনা জিজ্ঞাসা না করে জিজ্ঞাসা করুক যে, কার স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস লড়ছে? ভারতের শাসক শ্রেণীর স্বাধীনতা না সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা? যদি তিনি দেখেন যে, কংগ্রেস শাসক শ্রেণীর স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, তবে তার জিজ্ঞাসা করা উচিত, ভারতের শাসক শ্রেণী শাসন করার উপযুক্ত কি? কংগ্রেসকে সমর্থন করার আগে তিনি শুধু এইটুকু করুন।

কংগ্রেসিরা এই সব প্রশ্নের কি উত্তর দেবে? আমি জানি না। তবে আমি যা সত্যি মনে করি, প্রশ্নের উত্তরে তাই-ই বলব।

IV

এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার প্রভাব কোনও বিদেশির ওপর পড়লেও পড়তে পারে। যদি তিনি প্রভাবিত হন, তবে তিনি অবশ্যই প্রমাণ চাইবেন যে কিভাবে কংগ্রেস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে প্রাচীন হিন্দু শাসন ব্যবস্থা কয়েক করতে চাইছে। তারা বংশপরম্পরায় শাসক শ্রেণীকে শাসন করার ব্যবস্থা পাকা করতে চাইছে। আমি নিশ্চিত রূপে বলতে পারি না যে, প্রমাণ দেখে বিদেশিরা সন্তুষ্ট হবেন। তবুও এই প্রমাণ আমি তাদের সামনে তুলে ধরব।

ভারতে শাসক শ্রেণী কারা গঠন করে? ভারতীয়দের কাছে এ প্রশ্ন অবাস্তব। কিন্তু বিদেশিদের কাছে এটি প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়। ভারতে শাসক শ্রেণী মূলত ব্রাহ্মণরাই গঠন করে। বর্তমানে কোনও কোনও ব্রাহ্মণ অস্বীকার করেন যে, তারা শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা কিন্তু এককালে নিজেদের ভূ-দেব বলে দাবি করতেন। এই স্ব-বিরোধিতার কারণ কি? প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী নৈতিকতায় তাড়িত হয়ে তার নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থকে শ্রেণীস্বার্থের ওপরে স্থান দেয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের মতো আর কোনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এই নিয়ম লঙ্ঘন করে নি। ব্রাহ্মণরা যখন শাসকশ্রেণীর পরিচয় অস্বীকার করে, তখন মনে হয় যে তারা কোনও অপরাধ বোধে বিবেকের দংশনে জ্বলছে। ভাব দেখে মনে হয়, তারা যেন বিশ্বাসঘাতকের কাজ করছে। বিশ্বের দরবারে তারা যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অথবা, এ কি তাদের কোনও বিনয়ের প্রকাশ! কোনটা সত্যি, এ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই; কারণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণরাই যে শাসকশ্রেণী তা প্রশ্নের অতীত। প্রকৃত সত্য জানার জন্য দুই রকম পরীক্ষা করা যেতে পারে। প্রথমত, মানুষের মত নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত শাসন-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের তুলনামূলক আধিপত্য নিরীক্ষণ করা।

সাধারণ মানুষের চোখে, ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে সমাদৃত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সকল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মানুষ তাকে পূজনীয় বলে মনে করে। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে ব্রাহ্মণরা শোষিত শ্রেণীকে বঞ্চিত করে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। সে খুন করলেও তাকে ফাঁসি দেওয়া যেত না। তার কারণ, সে একজন পুণ্যাত্মা। একটা সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মণদের পা-ধোয়া জল না খেলে শোষিত শ্রেণীর কোনও মানুষ তার নিজের খাবার খেতে পারত না। স্যার পি. সি. রায় তাঁর ছেলেবেলার অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, কেমন করে শোষিত শ্রেণীর শিশুরা সারিবদ্ধভাবে কোনও ব্রাহ্মণ পথিকের জন্য অপেক্ষা করে থাকত। সে ব্রাহ্মণের পা-ধোয়া জল বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে তার বাবা মা সেটি পান করার পরে

তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে।

ভোগ করার প্রথম অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। মালাবার অঞ্চলে ‘সম্বন্ধম্’ রীতিতে বিয়ে প্রচলিত রয়েছে এবং সেখানে শোষিত জাত, যেমন—নায়ার, তাদের মেয়েদের ব্রাহ্মণদের রক্ষিতা করে রাখতে পারলে সম্মানিত বোধ করত। এমনকি রাজারাও ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানাত তাদের রানীর কুমারিত্ব মোচন করার জন্য।^১

ব্রিটিশ সরকারের শাসনকালে সকলের জন্য সমান আইন সম্মত অধিকারের ফলে ব্রাহ্মণদের এইসব সুযোগ সুবিধে এবং অধিকার লুপ্ত হয়। তবুও এই সব

১. ‘ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত পরিক্রমনের সময় মালাবারে এসে লুডো-ভিকো ডি ভারথোমা, লিখেছেন—‘ব্রাহ্মণরা আসলে কারা তা জানা অত্যন্ত সংগত ও সুখপ্রদ অভিজ্ঞতা। আমাদের পাদ্রিদের মতেই এরা ধর্মের প্রধান ব্যক্তি। রাজা যখন কোন রানীকে গ্রহণ করে তখন তিনি সবচেয়ে সম্মানীয় এবং যোগ্য ব্রাহ্মণকে তার রানীর সঙ্গে প্রথম রাত্রিবাসে কুমারীত্ব মোচন করার জন্য নির্বাচিত করেন। ব্রাহ্মণ কিন্তু স্ব-ইচ্ছাতেও এই কাজে লিপ্ত হন না। রাজা চার বা পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা রূপে দিতে বাধ্য থাকেন। কালিকটে শুধুমাত্র রাজাই এই প্রথা পালন করে থাকেন।’—‘ভয়েজেস্ অব্ ভার্থেমা’, (হাকলুইয়াত সোসাইটি,) খণ্ড ১ : পৃষ্ঠা : ১৪১।

অন্য পর্যটকরা বলেছেন যে, এই প্রথা সুদূরপ্রসারী ছিল। হ্যামিলটন তাঁর ‘অ্যাকাউন্ট অব্ দ্য ইস্ট ইন্ডিজ’-এ লিখেছেন:

‘সামরিনরা (Samorin) যখন বিয়ে করে, তখন একজন নাসুদ্রি বা প্রধান পুরোহিত যতক্ষণ না তার বধুকে ভোগ করছে, ততক্ষণ অবধি তারা সহবাস করতে পারবে না। ব্রাহ্মণ যদি তৃপ্ত হন তবে তিন রাত্রি বধুর সাথে যাপন করতে পারেন। কারণ সেই বধুর বিয়ের পরে প্রথম জাগতিক আকাজ্জা ঈশ্বরকে নিবেদন করতে হবে। এই প্রথা অনেক অভিজাতই মেনে নিতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষদের এই সুযোগ ভোগ করার সুবিধে ছিল না, উপরন্তু তারা শুধুই ভোগের উপকরণ যোগান দিতে বাধ্য ছিল।’— খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ৩০৪।

বুকানান তাঁর বর্ণনায় এই প্রথা সম্বন্ধে লিখেছেন, ‘সাধারণত নাসুদ্রিরা তামুর পরিবারের মহিলাদের অন্তঃসত্ত্বা করে দিত, তবে তারা যদি চাইতেন তবে নাসুদ্রিদের থেকে উচ্চবর্ণের কাউকে নিয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু নাসুদ্রিদের পবিত্রতার কারণে তারা অপ্রাধিকার পেত।’ পিনকারটনস্ ভয়েজেস্, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা : ৭৩৪। মাদ্রাজ সরকারের পরিচালনায় মালাবার এবং আনজেনগো থেকে প্রকাশিত গেজেটিয়ারের সম্পাদক শ্রী সি. এ. ইনস্(আই সি এস) লিখেছেন:

‘মারুকা কটায়াম এবং মাকটায়াম বিবাহ প্রথা যে সব শ্রেণীর মধ্যে চালু আছে তাদের মধ্যে আরও একটি প্রথা দেখা যায়। এই প্রথার নাম ‘টালি-বাঁধা বিবাহ’ যা মালিয়ালি বিবাহের রীতিতে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই রীতিতে কোন মেয়ের বয়ঃসন্ধি কালের আগেই কোনও একজন পুরুষ তার গলায় সোনা বা অন্য কোন ধাতুর মাদুলি বেঁধে দেয়। এই পুরুষটি এক-ই জাতের বা উঁচু জাতেরও হতে পারে। এই টালি বাঁধার পরেই মেয়েটি ‘সম্বন্ধম্’ করার অনুমতি পেত। সাধারণত এই উৎসবের মাধ্যমে টালি বন্ধনকারি বা মানাভালন মেয়েটির সাথে সহবাস করার সুযোগ পেত। এই অনুষ্ঠানের উৎস ‘ভূ-দেব’ প্রথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যদের মধ্যে, যেমন—ক্ষত্রিয় বা শাসক শ্রেণী, নীচু শ্রেণীর মহিলাদের কুমারিত্ব মোচন করার অধিকার অনেকটা যেন মধ্য যুগের কর্তৃত্বের অধিকারের মতেই প্রচলিত ছিল।’— খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১০১।

ঘটনাবলির সুবাদে ব্রাহ্মণরা আজও শোষিত শ্রেণীর চোখে অত্যন্ত পবিত্র এবং এখনও তাদের স্বামী বা সর্বময় কর্তা বলে সম্বোধন করা হয়।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি সমধিক ইতিবাচক ফল দেয়। শুধু মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। সারণি-২ দ্রষ্টব্য। এতে ১৯৪৩ সালে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজপত্রিত পদের (Gazetted Post) সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও এক-ই রকম পরিসংখ্যান এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে আনা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণরা তাদের অবস্থানকে অস্বীকার করলেও তারা রাষ্ট্র শাসন করে এবং শোষিত শ্রেণীরা যে তাদের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে, একথা অনস্বীকার্য। এর থেকে নিশ্চয়-ই প্রমাণিত হয় যে, তারাই শাসক শ্রেণী।

ব্রাহ্মণদের এই আধিপত্য একার পক্ষে বজায় রাখা অসম্ভব। সংখ্যালঘু হওয়ার জন্য তাদের শাসক শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকতে হলে, বন্ধুশক্তির প্রয়োজন। ফলস্বরূপ, আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, ব্রাহ্মণরা সব সময় অন্য শ্রেণীকে সহযোগী শক্তি হিসাবে পেয়েছে যাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে অধস্তন রেখে শাসন ভার তাদের হাতে তুলে দিয়েছে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে তারা ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা শ্রেণীদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে। ক্ষত্রিয়রা শুধু শাসন কার্যই করত না, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মিলিত শক্তি সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখতে বাধ্য করত। ব্রাহ্মণদের কলম এবং ক্ষত্রিয়দের তরবারিকে সম্মান জানানোর রীতি বাধ্যতামূলক ছিল। বর্তমানে ব্রাহ্মণরা বেনিয়া অর্থাৎ বৈশ্য শ্রেণীর সঙ্গে চুক্তি করেছে। চুক্তির এই বর্ণ পরিবর্তন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সংগত। আজকের এই ব্যবসায়িক দিনে তরবারির থেকে অর্থের ক্ষমতা অনেক বেশি। গোষ্ঠী বিন্যাসের এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দ্বিতীয়ত রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অর্থের উৎস শুধুমাত্র বেনিয়া শ্রেণী এবং তাদের কাছ থেকেই অর্থ আসছে।

বেনিয়ারা কংগ্রেসকে অর্থের যোগান দিচ্ছে, কারণ শ্রী গান্ধী তাদের শিখিয়েছেন যে, রাজনীতিতে অর্থ লগ্নী করলে অধিক লাভ করা যায়। এ বিষয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করছেন, তারা শ্রী লুই ফিশারকে ৬ই জুন ১৯৪২-এ, গান্ধী কি বলেছিলেন তা পড়ে দেখুন। শ্রী ফিশারের বই-‘এ উইক্ উইদ মিস্টার গান্ধী’, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি আকর্ষণীয় বিষয়ে আলোকপাত করছেন। ফিশার লিখছেন^১:

১. ‘এ উইক্ উইদ গান্ধী’ (১৯৪৩), পৃষ্ঠা ৪১।

সারণি - ২

সম্প্রদায়	আনুমানিক জনসংখ্যা লাখে	জনসংখ্যার অনুপাত	মোট রাজপত্রিত (Gazetted Post) পদের সংখ্যা (২,২০০)	নিযুক্তির অনুপাত	অ-রাজপত্রিত পদ		
					১০০ টাকার বেশি মোট সংখ্যা ৭,৫০০	৩৫ টাকার বেশি মোট সংখ্যা ২০,৭৮২	নিযুক্তির অনুপাত
					পদে আছেন	পদে আছেন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ব্রাহ্মণ	১৫	৩	৮২০	৩৭	৩,২৮০	৪৩,৭৩	৪২.৪
খ্রিস্টান	২০	৪	১৯০	৯	৭৫০	১,৬৫৫	০.৮
মুসলমান	৩৭	৭	১৫০	৭	৪৯৭	৪২২	৭.৭
দলিত শ্রেণী	৭০	১৪	২৫	১.৫	৩৯	৫২	৬৯
অ-ব্রাহ্মণ { অগ্রসর শ্রেণী	১১৩	২২	৬২০	২৭	২,৫৪৩	০৪৪	৪০.৬
পশ্চাৎপদ শ্রেণী	২৪৫	৫০	৫০	২		৩৩.৯	
ইঙ্গ-ভারতীয়	—	—	—	—	৩৭২	৫.০	৪
অন্যান্য সম্প্রদায়	—	—	—	—	১৯	৫	১১

‘আমি শ্রী গান্ধীর কাছে কংগ্রেস দল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমায় বলেছিলেন যে, শ্রী গান্ধীকে বোম্বাইয়ের অনেক মিল মালিক যারপরনাই অর্থ যোগান দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সে কারণে কংগ্রেস এখন বড় ব্যবসায়ীদের কবলে। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি দুঃখের সঙ্গে তা স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, ‘কংগ্রেসের কার্যভার পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত অর্থ নেই। প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম, প্রত্যেক সদস্যের কাছে চার আনা করে অনুদান নিয়ে দল চালাতে। কিন্তু এই সীমিত অর্থে কাজ হয়নি।’ আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম যে, ‘কংগ্রেসের বাজেটের কতটা ধনী ভারতীয়রা পূরণ করেন?’ গান্ধী জানালেন—‘প্রায় সবটাই। এই আশ্রমেই আমরা অনেক কম খরচে অনেক দরিদ্রের মতো থাকতে পারতাম। কিন্তু আমরা সেভাবে থাকি না এবং আমাদের অর্থবান বন্ধুরা অর্থ সাহায্য করে।’

বেনিয়ার অর্থের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণরা কখনই শাসক শ্রেণী থেকে তাদের বাদ দিতে পারবে না। শুধু কার্যক্ষেত্রে চুক্তিই নয়, বেনিয়া এখন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ। এর ফলে ভারতের শাসক শ্রেণী এখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ-বেনিয়া সমষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

শাসক শ্রেণীর পরিচয় বোধ হয় যথেষ্টই দেওয়া হল। এর পর দেখা দরকার যে, প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের পথে ১৯৩৭-এর নির্বাচনে শাসক শ্রেণী কি রকম ফল করেছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচন সার্বজনীন বা প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ওপর না হলেও এই নির্বাচনে শাসক শ্রেণী ছাড়াও আরও অনেক শ্রেণী ভোট দিয়েছিল। এই ধরনের ব্যাপক ভোট ১৯৩৭-এর আগে কখনও দেখা যায় নি। এই নির্বাচনের প্রকৃতি থেকে জানা যাবে যে, শাসক শ্রেণী শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে কি রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত কোন ভারতীয় সম্পাদক ডেডের পার্লামেন্টারি ম্যানুয়ালের মতো কোনও ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পারে নি। এই অসুবিধার জন্য কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্য পরিষদের নির্বাচিত প্রার্থীদের জাত, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সামাজিক পদমর্যাদা জানার কোনও উপায় নেই। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি এই সব তথ্য যোগাড় করার তাগিদ অনুভব করি। সকল প্রার্থী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য অবশ্য যোগাড় করতে পারি নি। অনেককেই আমি শ্রেণীভুক্ত করতে পারি নি। তা সত্ত্বেও যা তথ্য পেয়েছি তার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব নয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের একটা চিত্র সারণি ৩-য়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই সারণিতে শাসক শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ এবং বেনিয়াদের উপস্থিতির অনুপাত এবং শোষিত শ্রেণীতে অ-ব্রাহ্মণ ও তফসিলি জাতের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত দেখানো হয়েছে। এরা সকলেই কংগ্রেসের টিকিটে রাজ্য পরিষদীয় নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

ব্রাহ্মণরা যে মোট হিন্দু জনসংখ্যার কতটা সংখ্যালঘু তা না জানলে বুঝা যাবে না যে, কি হারে তারা অধিক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। তারা যে বিপুল হারে জয়ী হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশ্ববান ব্যবসায়ী, জমিদার ও বেনিয়ারা কি হারে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে তা সারণি ৪-য়ে উল্লিখিত পরিসংখ্যান থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে। এই সারণিতে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী বেনিয়া ব্যবসায়ী এবং জমিদারদের মোট সংখ্যাও জানা যাবে। এখানেও তারা তাদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হারে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে।

এই হচ্ছে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পরিষদীয় শাসক শ্রেণীর পরিস্থিতি। অনেকেই বলতে পারেন যে, শাসক শ্রেণী পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েছে। এখানে পরিষদে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা না দেখে বরঞ্চ প্রশাসনে তাদের আধিপত্যের ক্ষমতা দেখা উচিত। সুতরাং মন্ত্রীদের শ্রেণীর গঠন নিরীক্ষণ করা উচিত। এই বিষয়ে সারণি ৫ দ্রষ্টব্য।^১ এখানে দেখা যাবে যে মূখ্য শাসক শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বিপুল হারে মন্ত্রী পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। সমস্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণরাই প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। সকল হিন্দু প্রদেশে অ-হিন্দু মন্ত্রীদের বাদ দিলে, ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সংখ্যাই বেশি। এমনকি সমস্ত সংসদীয় সচিবরা ব্রাহ্মণ।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত ভারতে সুনির্দিষ্ট শাসক শ্রেণী বর্তমান এবং শোষিত শ্রেণীর থেকে তারা সম্পূর্ণ আলাদা। দ্বিতীয়ত সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে শাসক শ্রেণী অনায়াসে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে শোষিত শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। আর একটি দিক শুধু বাদ রয়েছে, যা দেখাতে পারলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। আমি দেখাতে চাই ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের জয়ের জন্য কংগ্রেস কতটা দায়ী ছিল। শাসক শ্রেণীকে শোষিত শ্রেণীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ যে কংগ্রেস করে দিয়েছে, তা নিশ্চিত ভাবে আমাকে প্রমাণ করতে হবে। অনেকে বলতেই পারেন যে, কংগ্রেসের এই জয়ে কোনও হাত ছিল না, বা কংগ্রেস দায়ী হলেও নির্বাচনের

১. তথ্য সূত্র—ভারত সরকারের প্রকাশনা 'ইনফারমেশন', ১৯৩৯ সালের ১৫ জুলাই সংখ্যা।

ফল নেহাত-ই একটা দুর্ঘটনা এবং শাসক শ্রেণীর বিজয়কে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ছিল না।

V

এসব যুক্তির প্রথম পংক্তিই অবশ্য অচিরেই খণ্ডন করা যায়। যারা এই যুক্তি দেখাচ্ছেন, তারা বোধ হয় সারণি ৩, ৪, ৫, ৬-তে উল্লিখিত প্রদেশের রাজনৈতিক চরিত্র জানেন না। এইসব প্রদেশে কংগ্রেস-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং মন্ত্রিসভাও কংগ্রেসের দখলে। সুতরাং এইসব অঞ্চলে শোষিত শ্রেণীর ওপর শাসক শ্রেণীর শাসন কায়েম করার পেছনে কংগ্রেসের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। কংগ্রেস অত্যন্ত সুশৃঙ্খল দল। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাদের ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে সংসদীয় পর্ষদ গঠন করা হয়েছিল। এই পর্ষদের কাজ ছিল—(১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী বাছাই করা। (২) মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং (৩) মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা। এইসব প্রাদেশিক সংসদীয় পর্ষদের ওপরে একটি কেন্দ্রীয় সংসদীয় পর্ষদ গঠন করা হয় প্রাদেশিক পর্ষদগুলির ওপর তদারকি করার জন্য। এই নির্বাচন সম্পূর্ণ কংগ্রেসের পরিকল্পনা এবং তারাই নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করেছে। সুতরাং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসি প্রদেশে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতায় আসার পেছনে কংগ্রেস যে দায়ী নয়—এমন কথা ভাববার কোন যুক্তিই নেই।

এর পরে যারা বলবেন যে, কংগ্রেসি প্রদেশগুলিতে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতায় আসাটা নিছক-ই দুর্ঘটনা, তারা নিশ্চিত থাকুন যে তাদের এই ধারণাটি যুক্তিহীন। আমি তাদের পরবর্তী ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রথমেই তারা যেন কংগ্রেস হাই কমান্ডের সদস্যদের মানসিকতা লক্ষ্য করেন। এই হাই কমান্ডের সদস্যরা এ যাবৎ কংগ্রেসের ভাগ্য নির্ধারণ করে এসেছেন এবং বর্তমানে তারাই কংগ্রেসকে পরিচালনা করছেন। শ্রী তিলককে দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি আজ মৃত। কিন্তু জীবিতকালে তিনি কংগ্রেসের প্রচণ্ড প্রতাপশালী নেতা ছিলেন। শ্রী তিলক শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একজন ব্রহ্মণ ছিলেন। যদিও তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক বলে মানা হয়, তবুও তাঁর শোষিত শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার মনোভাব সর্বজনবিদিত। স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য আমি শুধু একটি উদাহরণ দেব। ১৯১৮ সালে যখন অ-ব্রাহ্মণ ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ সংসদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্য আন্দোলন করছে, তখন সোলাপুরে এক জনসভায় শ্রী তিলক বলেন যে, তিনি ঘাঞ্চি, তামাক বিক্রেতা, ধোপা ইত্যাদি লোকের সংসদে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারছেন না। এই ছিল তাঁর অ-ব্রাহ্মণ এবং অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে ধারণা।

তঁর মতে এদের কাজ শুধু আইন মান্য করা, আইন তৈরি করার ক্ষমতা দাবি করা নয়।

তিলকের পরে আমি শ্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কথা বলতে চাই। একটা ঘটনা থেকেই তঁর মানসিকতা তুলে ধরব। ১৯৪২ সালে লর্ড লিনলিথগো বিভিন্ন শ্রেণীর ৫২ জন বিখ্যাত ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানান কেন্দ্রীয় সরকারকে জনপ্রিয় করার নীতি নির্ধারণের জন্য। যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়ার জন্যই তিনি এই প্রচেষ্টা করেছিলেন। তফসিলি জাতের সদস্যরাও আমন্ত্রিত ছিলেন। তাদের উপস্থিতিকে বল্লভভাই প্যাটেল মোটেই মেনে নিতে পারেননি। এই আলোচনা সভার কিছুদিন পরেই আমেদাবাদে একটি ভাষণে তিনি বলেন^১: ‘বড়লাট হিন্দু মহাসভার নেতাদের ডেকে ছিলেন, মুসলিম লীগের নেতাদের ডেকে ছিলেন এবং ঘাঞ্চি (যারা ঘানি টানে), মোচি (যারা জুতো বানায়) এবং বাকিদের ডেকে ছিলেন।’

শ্রী প্যাটেল শুধুমাত্র ঘাঞ্চি এবং মুচিদের উল্লেখ করেলেও তঁর ভাষণে দেশের শোষিত শ্রেণীর প্রতি তাক্সিল্যের ভাব স্পষ্ট।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রতিক্রিয়াও জানা ভাল। তিনি একজন ব্রাহ্মণ হলেও অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বলে পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তঁর বাবা ১৯৩১ সালে মারা যাওয়ার পর গঙ্গার তীরে গোঁড়া হিন্দু মতে শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এর পরে কোনও মানুষকে ধর্ম নিরপেক্ষ বলা চলে না। আর তার অসাম্প্রদায়িকতার সম্বন্ধে স্বয়ং ডঃ পটুভি সীতারামাইয়া বলেছেন যে পণ্ডিত নেহরু নিজের ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকেন। যাঁরা মনে করেন যে, নেহরু অত্যন্ত জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতা, তাঁদের কাছে এ তথ্য নিশ্চয় চমকপ্রদ। কিন্তু ডঃ সীতারামাইয়া নিশ্চয় জানেন যে, তিনি কার সম্বন্ধে কি বলছেন। আরও অবাক লাগে যখন দেখি যে, নেহরুর আদি নিবাস যে যুক্তপ্রদেশে, যেখানে তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী। সেখানকার মন্ত্রিসভার সকলেই ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর খ্যাতনামা বোন শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতও ব্রাহ্মণ বলে গর্ব বোধ করেন। ১৯৪০ সালের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘ভারত মহিলা সম্মেলনে’ আসন্ন জনগণনায় নিজের জাত উল্লেখ না করার বিষয়টি আলোচিত হয়। শ্রীমতি পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেন।^২ তিনি বলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ হিসাবে গর্ববোধ করেন এবং

১. শ্রী জে. ই. সঞ্জনা দ্বারা উদ্ধৃত—‘সেন্স অ্যান্ড ননসেন্স ইন পলিটিকস’—ক্রমিক নং XII; ১৯৪৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি রাস্ত রাহাবার (বম্বের গুজরাটি সাপ্তাহিক) পত্রিকা।

২. ওয়াই. জি. কৃষ্ণমূর্তির ‘ইনভাইটেশন টু জওহরলাল নেহরু’, পৃষ্ঠা : XVI দৃষ্টব্য।

৩. সঞ্জনা কর্তৃক উদ্ধৃত : ‘সেন্স অ্যান্ড ননসেন্স ইন পলিটিকস’—ক্রমিক নং XII, রাস্ত রাহাবার, ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৫ সংখ্যায়।

আসন্ন জনগণনায় নিজ জাত উল্লেখ না করার কারণ বুঝতে পারেন না। এরা কারা? এদের পদমর্যাদা কি? শ্রী তিলককে স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক মানা হয়। কংগ্রেস দলে শ্রী গান্ধীর পরেই শ্রী প্যাটেল ও পণ্ডিত নেহরুর পদমর্যাদা।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সম্পর্কে এগুলি বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত ধারণা। সেরকম ভাবলে মস্ত ভুল হবে। অজস্র ঘটনা আছে যেখানে কংগ্রেস এইসব ধারণাকে ভিত্তি করে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছে।

১৯১৯ সাল থেকে শ্রী গান্ধী কংগ্রেসকে আচ্ছন্ন করার পর থেকেই কংগ্রেসিরা সংসদ বয়কট করে ব্রিটিশ সরকারের থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সহজ পন্থা বলে মনে করে। এই নীতিতে প্রত্যেকবার কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকত। শুধু তাই নয়, তারা যে কোনও হিন্দু নির্দল প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচার চালাত। এই নীতির কার্যকারিতা নিয়ে তর্কের প্রয়োজন নেই, তবে নির্দল প্রার্থীদের নির্বাচনে বিরত থাকার জন্য তারা কি পন্থা নিত, সেটাই আলোচ্য বিষয়। সংসদ এবং ব্রিটিশ আইনসভাকে ঘৃণার বস্তু হিসাবে তুলে ধরাটাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসিরা প্লাকার্ড হাতে প্লোগান দিত: ‘সংসদে এবার যাচ্ছে কারা? নাপিত, মুচি, কুমোর, মেথর—আবার কারা!’ মিছিলে একজন প্রশ্ন করত তারপর পুরো মিছিল উত্তর দিত। কংগ্রেসিরা যখন দেখল যে, এতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে আটকানো যাচ্ছে না, তখন তারা আরও শক্ত প্যাঁচ কষল। কংগ্রেস বিশ্রাম করত যে নীচু জাতের লোকদের সাথে সংসদে বসার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তাই এবার তারা নীচু জাতের প্রার্থীদের কংগ্রেস টিকিটে দাঁড় করিয়ে নির্বাচনে জিতিয়ে দিল। উদাহরণ স্বরূপ কংগ্রেসের এই জঘন্য আচরণের কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। ১৯২০ সালের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় প্রদেশের সংসদে কংগ্রেসের টিকিটে একজন মুচি নির্বাচিত হন। ১৯৩০-এর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় প্রদেশের সংসদে দু’জন মুচি, একজন গোয়ালী,^১ এবং একজন নাপিত^২ ও পঞ্জাবের একজন মেথর^৩ নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ সালে কেন্দ্রীয় সংসদে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে একজন কুমোর^৪ নির্বাচিত হন। এসব আজ ইতিহাস। কিন্তু ১৯৪৩-এর বোম্বাইয়ের আন্দোলনের পুরসভা নির্বাচনের

১. ফাগুয়া রোহিদাস

২. গুরু গোসাই আগামদাস এবং ববরাজ জৈয়ার

৩. চম্বু

৪. অর্জুন লাল

৫. বংশীলাল চৌধুরি

৬. ভগত চাঁদমাল গোদা

ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সাধারণ মানুষ যাতে পুরসভা বর্জন করে, তার জন্য কংগ্রেস একজন নাপিতকে প্রার্থী রূপে দাঁড় করায়।

শাসক শ্রেণীর পক্ষে এ কিরকম মানসিকতা! নির্লজ্জের মতো নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কুৎসিত ভাবে শোষিত শ্রেণীকে ব্যবহার করে আবার তাদের-ই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার দাবি তারা কি ভাবে জানায়? শোষিত শ্রেণীর কাছেও এভাবে নিজেদের অসম্মান করে গর্বিত হওয়া অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার! আয়ারল্যান্ডে 'সিন ফিয়েন পার্টি'ও ব্রিটিশ সংসদকে বয়কট করেছিল। কিন্তু তাঁরা কি নিজের দেশবাসীকে এত জঘন্য ভাবে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করেছিল? ১৯৩০ সালের সংসদ বয়কট বিশেষভাবে বিবৃত করে সেই বছরের নির্বাচনে যখন এই ঘটনাগুলি ঘটেছে, তখন সেই সময়েই শ্রী গান্ধী লবণ আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ চালাচ্ছিলেন। এই সময়কার বিবরণ ডঃ পটুভি সীতারামাইয়া নথিভুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, শ্রী গান্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনকে নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাদের দাবি মেনে না নিলে কিভাবে শ্রী গান্ধী 'লবণ আইন অমান্য' করেছিলেন, কিভাবে তিনি 'ডান্ডি অভিযান' কথা ভেবেছিলেন, কিভাবে তিনি আমেদাবাদের আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানে মহিলারা তাকে আরতি করে মাথায় তিলক পরিয়ে দিয়ে বিজয় কামনা করেছিল। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গুজরাট একাই ভারতের স্বাধীনতা এনে দেবে এবং স্বাধীনতা না এনে তিনি আমেদাবাদে ফিরবেন না, এই ঘোষণা করেছিলেন। তাব কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক একটি তথ্য লিখতে ভুলে গেছেন। সেই সময়েই জনগণের জন্য স্বাধীনতা আনার দাবি জানানো কংগ্রেসিরা জনগণের একাংশকে ঘৃণিত ও বর্জনীয় হিসাবে তুলে ধরে জনগণের ওপর জঘন্যতম অন্যায় করেছে। এ ঘটনা যেন কংগ্রেসের ভাবী ঐতিহাসিকরা লিখতে ভুলে না যান।

সারণি - ৩

প্রাদেশিক আইনসভায় জাত-ভিত্তিক কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা

প্রদেশ	ব্রাহ্মণ	অ-ব্রাহ্মণ	তফসিলি	বিবৃত হয়নি	মোট
অসম	৩	২১	১	৫	৩০
বাংলা	১৫	২৭	৩	৩	৫৮
বিহার	৩১	৩৯	১৩	১২	৯৫
মধ্যপ্রদেশ	২৮	৩৫	৭	—	৭০
মাদ্রাজ	৩৮	৯০	২২	৫	১৫৫
ওড়িশা	১১	২০	৫	—	৩৬
যুক্তপ্রদেশ	৩৯	৫৮	১৩	২৪	১৩৩

সারণি - ৪

প্রাদেশিক আইনসভায় পেশা-ভিত্তিক কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা

প্রদেশ	আইনজীবী	চিকিৎসক	জমিদার	ব্যবসায়ী	বেসরকারি	দানদার	কিছুই নয়	বিবৃত হয়নি	মোট
অসম	১৬	২	২	১	—	—	৩	২	৩৩
বাংলা	২	২	১৬	৫	২	—	১৬	৪	৪১
বিহার	১৪	৪	৬৬	৬	৩	—	১	১৫	৭৫
মধ্যপ্রদেশ	২০	২	২৫	০৫	—	—	৭	৫	৭০
মাদ্রাজ	৫২	২	৪৪	৭৫	২	১	৩	৩৬	১৯১
ওড়িশা	৭	১	১৭	৪	৪	১	১	—	৩৬

সারণি - ৫

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মন্ত্রিসভার গঠন

প্রদেশ	মন্ত্রিসভার মোট সদস্য	অ-হিন্দু সদস্য	মন্ত্রিসভায় হিন্দু সদস্য				প্রধানমন্ত্রী
			মোট	ব্রাহ্মণ	অ-ব্রাহ্মণ	তফসিলি জাত	
অসম	৭	৩	৫	?	?	—	ব্রাহ্মণ
বিহার	৪	১	৩	?	?	১	ব্রাহ্মণ
বোম্বাই	৬	২	৫	৩	২	—	ব্রাহ্মণ
মধ্যপ্রদেশ	৫	১	৪	৩	১	—	ব্রাহ্মণ
মাদ্রাজ	৯	২	৭	৩	৩	১	ব্রাহ্মণ
ওড়িশা	৩	—	৩	?	?	?	ব্রাহ্মণ
যুক্তপ্রদেশ	৬	২	৪	৪	—	—	ব্রাহ্মণ

মে, ১৯৩৯ সালের ভিত্তিতে এই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে, যা 'ইন্ডিয়ান ইনকরপোরেশন'-এর জুলাই ১৯৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রমবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে ব্রাহ্মণ না অ-ব্রাহ্মণ নির্ণয় করা যায় নি।

সারণি - ৬

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে পরিষদীয় সচিবদের শ্রেণী বিন্যাস

প্রদেশ	মোট পরিষদীয় সচিব	মোট অ-হিন্দু পরিষদীয় সচিব	হিন্দু পরিষদীয় সচিব			
			মোট	ব্রাহ্মণ	অ-ব্রাহ্মণ	তফসিলি জাত
অসম	—	—	—	—	—	—
বিহার	৭	—	৮	২	৫	১
বোম্বাই	৬	—	৬	১	৫	—
মধ্যপ্রদেশ	—	—	—	—	—	—
মাদ্রাজ	৭	১	৯	৩	৪	১
ওড়িশা	৩	—	৩	১	১	—
যুক্তপ্রদেশ	২২	১	১১	২	৩	১

ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন'-এর জুলাই ১৫, ১৯৩৯ সংখ্যা থেকে সংকলিত। প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে ব্রাহ্মণ না অ-ব্রাহ্মণ, নির্ণয় করা যায় নি।

VI.

শোষিত শ্রেণীর প্রতি কংগ্রেস হাই কমান্ডের এধরনের মানসিকতা প্রমাণ করে যে, কংগ্রেসি প্রদেশে শাসক শ্রেণীর আধিপত্য নিছক-ই দুর্ঘটনা নয়। সারণি-৭ আরও অনেক তথ্য দেওয়া আছে এর স্বপক্ষে। এই সারণিতে নির্বাচনে কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জানা যাবে। সারণি থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে স্নাতক এবং স্নাতক নয় এমন প্রার্থীদের আপেক্ষিক অনুপাত অ-ব্রাহ্মণ এবং তফসিলি জাতদের তুলনায় অনেক বেশি। এই বৈষম্য কি কোনও নীতি বিদ্রাটের ফল? এই ধরনের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কংগ্রেস হাই-কমান্ডের যে একটা সমতা রক্ষা করার উদ্দেশ্য ছিল তা পরিষ্কার। যেমন, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে যে প্রার্থীর সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে, তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার অন্য দিকে, অ-ব্রাহ্মণ এবং তফসিলি জাতদের ক্ষেত্রে যে প্রার্থীর সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তাকেই নির্বাচনে প্রার্থী পদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ প্রার্থীদের পদ মর্যাদার প্রকৃত পার্থক্য বুঝা সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণ প্রার্থীরা শুধুমাত্র স্নাতকই নয়, তারা এক একজন দক্ষ রাজনীতিক। অ-ব্রাহ্মণ প্রার্থীরা স্নাতক হলেও তারা অনভিজ্ঞ এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা সু-উপযুক্ত নয়।

তাহলে কংগ্রেস কেন শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত ব্রাহ্মণদের নির্বাচনের প্রার্থী করল? আর অ-ব্রাহ্মণ এবং তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কেনই বা প্রায় অশিক্ষিত প্রার্থীদের নির্বাচনে দাঁড় করাল? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর আমি দেখতে পাই। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, মন্ত্রীত্ব থেকে অ-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বঞ্চিত করা। বেশি শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণ যে দেশে পাওয়া যায় নি এমন নয়। কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য ছিল একজন শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণের থেকে একজন অশিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণকেই প্রার্থী রূপে দাঁড় করান। কিন্তু তাই বা কেন? শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণের তুলনায় অশিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণকে প্রার্থী করলে দুটি নির্দিষ্ট সুবিধা আছে।

প্রথমত সে কংগ্রেস হাই-কমান্ডের কাছে একজন শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণের থেকে, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য অনেক বেশি কৃতজ্ঞ থাকবে। দ্বিতীয়ত কংগ্রেস দলের মধ্যে অশিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণরা শিক্ষিত অ-ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকারের পতন ঘটিয়ে, অ-ব্রাহ্মণ মন্ত্রিসভা গঠনে খুব একটা সচেষ্ট হবে না। তৃতীয়ত অনভিজ্ঞ অ-ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কংগ্রেসে যত বেশি হয় ততই তাদের বিকল্প যোগ্য

সরকার গঠনের সুযোগ কম থাকে।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিধায় কি বলা যায় না, যে স্বাধীনতার যুদ্ধ আসলে শাসক শ্রেণীর-ই স্বাধীনতার জন্যে! কংগ্রেস-ই যে শাসক শ্রেণী এবং শাসক শ্রেণীর অপর নাম যে কংগ্রেস তাতে কি সন্দেহ আছে? স্বশাসিত অঞ্চলের মাধ্যমে ১৯৩৭ সালে স্বরাজের স্বাদ পেয়ে কংগ্রেস কি ইচ্ছাকৃত ও নির্লজ্জভাবে শাসক শ্রেণীকে ক্ষমতার অধিষ্ঠানে বসায়নি?

সারণি - ৭ শিক্ষার নিরিখে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণ

প্রাদেশিক আইনসভা	জাত	মোট	স্নাতক	স্নাতক-নিম্ন	মেট্রিকুলেট	নিরক্ষর	বর্ণিত হয় নি
অসম	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ	৩	৫	১	—	১	১
বাংলা	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ তফসিলি	২১ ১৫ ২৭	১৫ ১৪ ২১	২ ৪	—	১ ২	৭
বিহার	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ তফসিলি	৩১ ৩৬	১১ ২৩	৫ ৪	১ ৩	৪ ৮	৩ ১৩
মধ্যপ্রদেশ	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ তফসিলি	৩৬ ৫৪	১৫ ১৫	১	—	১০ ১৫	৭ ১
মাদ্রাজ	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ তফসিলি অনুন্নত শ্রেণী	৩৮ ৯০ ২৬	১ ২৩ ৩১	১ ৩ ১	১ ১ ১	৪ ৭ ১৪	১৩ ১১
ওড়িশা	{ ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ তফসিলি	১১ ২০ ৫	৩ ৭	১ ৩	—	১ ৭	১ ১

VII

উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্টায় বলা যায় যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বিকৃত হয়েছে। কংগ্রেস দলও একটি বিকারগ্রস্ত রাজনৈতিক দল-এ পরিণত হয়েছে। এটি একটি গুরুতর অপরাধ হয়েছে। বিদেশিরা এই অপরাধের চরিত্র বুঝতে গেলে তাঁদের ভারতের শাসক শ্রেণীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজ-দর্শন জানতে হবে।

ব্রাহ্মণদের দিয়েই শুরু করা যাক। এরা শাসক শ্রেণীর এক শক্তিশালী অংশ। ভারতের মোট ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যার অন্তর্গত শোষিত শ্রেণীর শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের পরম শত্রু হিসাবে ব্রাহ্মণদের চিহ্নিত করলে কোনও অত্যাধিকার হবে না। ব্রাহ্মণদের জীবন দর্শনের জন্যেই আজ ভারতের শোষিত শ্রেণী চরম দূরবস্থায় পতিত হয়েছে। এই দর্শন বা প্রকৃত পক্ষে ছয়টি নীতি ছিল—(১) বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নির্দিষ্ট বৈষম্য, (২) শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা, (৩) শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের শিক্ষার সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া, (৪) ক্ষমতার আসনে থেকে শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের সম্পূর্ণ বিতাড়িত করা, (৫) সম্পদ অধিগ্রহণে শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের সম্পূর্ণ ভাবে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া, (৬) মহিলাদের ওপর কর্তৃত্ব করে তাদের দমিয়ে রাখা। বৈষম্য করা ব্রাহ্মণ ধর্মের নীতিগত বৈশিষ্ট্য। নীচু শ্রেণীর মানুষদের নির্যাতন করা এবং ক্ষমতা আনার সামান্যতম প্রয়াস খর্ব করাকে ব্রাহ্মণরা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শিক্ষার অধিকারকে শুধু তাদের মধ্যে সীমিত রেখেছে। নীচু শ্রেণীর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করলে, ব্রাহ্মণরা তার জিভ কেটে বা কানে গরম সীসে ঢেলে শাস্তি দেওয়ার আদেশ দিত। এর ফলে বহু শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণরা নীচু শ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে এসেছে। আজও তাদের শিক্ষার প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব অপরিবর্তিত রয়েছে। ১৮৯১ সালের আদমশুমার মহাধ্যক্ষ শ্রী বেন্স সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব সম্বন্ধে লিখেছেন—

‘শিক্ষার প্রসারের দ্বিতীয় অন্তরায় বংশ পরম্পরায় একটি শ্রেণী পুঁথিগত শিক্ষাকে তাদের-ই একমাত্র অধিকার করে সমাজে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যাজকরা জানে যে, তারা একমাত্র অশিক্ষিত মানুষকেই শাসন করতে পারে। কেরানি শ্রেণীর উত্থান সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের যে আপত্তি ছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আজ অবধি এই দুই শ্রেণীর তিক্ততা শিক্ষার প্রসার ব্যাহত করেছে। একথা সত্যি যে, প্রাথমিক

শিক্ষার ওপর ব্রিটিশ সরকারের গুরুত্ব দেওয়াকে অনেক শিক্ষিত মানুষ-ই সাধুবাদ জানিয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এছাড়া করারও কিছু নেই। তবে এই প্রয়াস বিভিন্ন জাতের মানুষকে জীবিকার সুযোগ করে দেবে। প্রাথমিক শিক্ষার পর এদের মধ্যে থেকেই শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। তবে প্রাথমিকের পরে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বিগ্নজনক অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষিত জাতেরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রতি বেশি রক্ষণশীল এবং এই অধিকারকে একান্তভাবে তারাই ভোগ করতে চেয়েছে।

কংগ্রেস অভিযোগ করে যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের একেবারে নিরস্ত্র করে রাজত্ব করছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের নিরস্ত্র করার নিয়ম ব্রাহ্মণরাই চালু করেছিল। এমনকি, এই নিয়ম পুনর্নির্ধারণের সময়েও ব্রাহ্মণরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা সুরক্ষিত করে শূদ্র ও অচ্ছুৎদের পদদলিত করে রাখতে আরও কঠোর হয়ে ওঠে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের-ই মনে হয় মনুষ্যত্বহীন। তাদের যেন কোনও অনুভব নেই, কোনও পৌরুষ নেই। এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য যুগের পর যুগ ধরে তাদের ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিরস্ত্রীকরণ ভীষণভাবে দায়ী। এমন কোনও সামাজিক অপরাধ বা অন্যায় ছিল না, যা ব্রাহ্মণরা সমর্থন করে নি। মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা, জাতভেদ, অস্পৃশ্যতা, কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার এবং খোলা চোখে দেখার অধিকার খর্ব করা—এ সব-ই ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় অনুশাসন। অবশ্য পুরুষ মানুষের অন্যায়কেই তারা ধর্ম বলে মনে করত, একথা ভাবা ভুল হবে। মহিলাদের প্রতি চরম অন্যায়ও ব্রাহ্মণরা সমর্থন করেছে। ভারতবর্ষে সতীত্বের দোহাই দিয়ে জীবিত অবস্থায় বিধবাদের দাহ করা হত এবং ব্রাহ্মণরা তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করত। বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, ব্রাহ্মণরাই এই বিধান দিয়েছিল। আট বছরের আগেই মেয়েদের বিয়ে দিতে হত। এবং তার যৌবন প্রাপ্তির আগে যে কোনও সময়ে তার স্বামীর তাকে ত্যাগ করার অধিকার ছিল। ব্রাহ্মণরা এই প্রথার পক্ষেই ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীদের তুলনায় ব্রাহ্মণরা অচ্ছুৎ এবং মহিলাদের জন্য যে অমানুষিক নিয়ম তৈরি করেছিল তার জুড়ি মেলা ভার। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণরা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নিজের দেশবাসীকে চিরশোষিত, অজ্ঞ এবং দরিদ্র রাখার জন্য কূটকৌশল আবিষ্কারে নিজেদের অজ্ঞতাকে বিকিয়ে দেয় নি। আজও প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করে যে, তার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পূর্বপুরুষ দ্বারা সৃষ্ট। হিন্দু সমাজে সে যেন এক বিদেশি আগন্তুক। জার্মানরা যেমন ফরাসিদের কাছে বিদেশি, ইহুদিরা যেমন অ-ইহুদিদের কাছে, শেতাঙ্গরা যেমন নিগ্রোদের কাছে, তেমন-ই ব্রাহ্মণরাও শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের

কাছে বিদেশির মতো। শূদ্র এবং অচ্ছুৎদের মতো নীচু শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিরাট ব্যবধান। ব্রাহ্মণরা তাদের কাছে শুধু বিদেশিই নয়, শত্রুও বটে। তাদের প্রতি ব্রাহ্মণদের অচরণে ন্যায় এবং বিবেকের কোনও স্থান নেই।

ইতিহাসে, বেনিয়াদের মতো জঘন্য পরজীবী শ্রেণীর জুড়ি মেলা ভার। অর্থ উপার্জনের জন্য এরা বিবেক ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছে। এরা তাদের-ই মতো যারা মহামারি থেকে লাভবান হবার স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ, কবরস্থানে যারা কাজ করে, তাদের সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু একটাই, কবরস্থানে যারা কাজ করে, তারা মহামারির জন্য দায়ি নয়। কিন্তু বেনিয়ারা মহামারির সৃষ্টি করে। বেনিয়ারা উৎপাদন ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করে না। চড়া হারে সুদের ব্যবসা করে মানুষকে দারিদ্র্যের মধ্যে ঠেলে দেয়। সুদ খাটিয়েই তার জীবন কাটে। ঋষি মনুর নিদান অনুযায়ী সুদ খাটানোর ব্যবসা তার কাছে পবিত্র এবং সঠিক ধর্ম। ব্রাহ্মণদের বিচারের সাহায্যে এবং সহায়তায় বেনিয়ার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুদ, সুদের সুদ দিনের পর দিন বেড়েই চলে এবং লক্ষ লক্ষ পরিবার সেই সুদের জালে চিরকালের মতো জড়িয়ে পড়ে। যতই তাকে টাকা দেওয়া যাক না কেন, যে একবার ঋণ নিয়েছে, তার ঋণ কোনদিন-ই শোধ হয় না। জালিয়াতি এবং ছল চাতুরি করতে তার বিবেকে বিন্দুমাত্র বাধে না। জাতির ওপর তার করাল ছায়াপাত সম্পূর্ণ। ভারতবর্ষের সমস্ত দরিদ্র, অশিক্ষিত, বুদ্ধিমানুষ বেনিয়াদের কাছে পুনরুদ্ধারে অসাধ্য বন্ধকে আবদ্ধ।

প্রত্যেক দেশেই একটি শাসকশ্রেণী আছে। কোনও দেশেই এদের কবল থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু কোথাও এ ধরনের স্বার্থপর, বিকৃত মনস্ক, অসুস্থ শাসকশ্রেণী ক্ষতিকারক এবং কুখ্যাত জীবন দর্শন নিয়ে শোষিতশ্রেণীকে পদদলিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে—এমনটা দেখা যায় না। আমি অন্তত জানি না। তবে এতো সত্যি যে, অন্যান্য দেশেও শাসকশ্রেণী সমাজে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু তাদের সমকক্ষ যারা হতে পেরেছে, তাদের প্রবেশাধিকার আছে। এদের সমকক্ষ হতে কাউকে এরা বাধাও দেয় না। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী জন্মসূত্রে অন্য শ্রেণীর মানুষদের স্বীকৃতি দেয় না এবং তাদের সমকক্ষ হওয়ার সমস্ত প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করে।

VIII

ফরাসি বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে শাসকশ্রেণী ছিল। উনিশ শতকের ৭০-এর দশকের আগে জাপানে শাসক শ্রেণী ছিল। এই সময়ে জাপান তার সংবিধানকে আধুনিক করে তোলার প্রয়াসী হয়। উভয় দেশ-ই জাতীয় সংকট অনুভব করে তাদের প্রাচীন সুযোগ-সুবিধা বর্জন করার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র থেকে দেশকে গণতন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়।

ফ্রান্সে বিপ্লবের সময় সাম্যের দাবি তোলা হলে শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমতা সমর্পণ করে। অভিজাতবর্গ, যাজকবর্গ এবং জোতদারদের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে গঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ (State-General) যখন ডাকা হয়, তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। কমনস্ বা সাধারণ মানুষ ৬০০ জন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়। অন্যদিকে যাজক এবং অভিজাতরা প্রত্যেকে ৩০০ জন প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পান। ৬০০ জন প্রতিনিধিত্ব করেন। এই ১২০০ সদস্য কিভাবে বসবেন, বিতর্কে অংশ নেবেন এবং ভোট দেবেন, সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সাধারণরা দাবি তোলে, সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ব্যবস্থাপকসভার অধীনে আনা মাথাপিছু ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই প্রস্তাব যাজক এবং অভিজাতদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব মনে হয়েছিল। কারণ, এর ফলে তাদের অধিকাংশ প্রাচীন এবং মূল্যবান সুযোগ-সুবিধে বিসর্জন দিতে হত। তা সত্ত্বেও এদের অনেকেই এই দাবি মেনে নেয় এবং মুক্তি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতিতে ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচিত হয়।

জাপানে, ১৮৫৫ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আধুনিকতার পথে রূপান্তরিত হচ্ছে, সে সময়ে জাপানের শাসকশ্রেণীর আচরণ ফরাসি শাসকশ্রেণীর থেকে অনেক বেশি স্বার্থত্যাগে ব্রতী হয়েছিল। জাপানের ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে, তাদের সমানে চারটি শ্রেণী ছিল। (১) 'দামিয়োজ', (Damiyos) (২) 'সামুরাই', (Samurai) (৩) 'হেমিন' (Hemin) বা সাধারণ মানুষ (৪) 'এটা' (Eta) বা জাতিচ্যুত মানুষ—যারা ক্রমিকভাবে একে অন্যর ওপরে ছিল।

সমাজের সবচেয়ে নীচুতলার ছিল 'এটা', শ্রেণীর কয়েক হাজার মানুষ। 'এটা'দের ওপরে আড়াই থেকে তিন কোটি মানুষ 'হেমিন' সম্প্রদায়ের। এদের ওপরে ছিল ২০ লক্ষ 'সামুরাই' শ্রেণী, যারা 'হেমিন'দের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল। সমাজের শীর্ষে ছিল 'দামিয়োজ' বা সামন্ত শাসকশ্রেণী। এদের সংখ্যা মাত্র ৩০০ হলেও অন্য

তিনটি শ্রেণীর ওপর এরা প্রভুত্ব করত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে এই শ্রেণী-ব্যবস্থা নিয়ে সম অধিকারের আধুনিক জাতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে এই সামন্ততন্ত্র এক বিরাট বাধা, তা ‘দামিয়োজ’ ও ‘সামুরাই’ উভয়েই অনুভব করেছিল। তাই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ‘দামিয়োজ’ শ্রেণী তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা বর্জন করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের পথে সামিল হয়েছিল। তারা এক স্মারক পত্রে ১৮৬৯ সালের ৫ই মার্চ সশ্রুটিকে জানায়—

‘আমরা যে স্থানে বাস করি তা সম্রাটের অধীনে। যে খাবার খাই, তা সম্রাটের লোকেরাই উৎপাদন করে। তাহলে কেমন করে আমরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি নিজের বলে দাবি করব? আমরা এবং আমাদের অনুগতেরা (‘সামুরাই’ এবং সাধারণ মানুষরা) প্রার্থনা করছি যে, আপনি যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে যোগ্যদের পুরস্কৃত এবং অনুপযুক্তদের জরিমানা করুন। বিভিন্ন জাতির পরিবর্তন এবং নবীকরণ করার জন্য আজ্ঞাদেশ দিন। সমস্ত দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধি, সৈন্যবাহিনীর পরিচ্ছেদ থেকে যুদ্ধের উপকরণ সম্বন্ধে যাবতীয় নিয়মাবলী সম্রাটের আদেশ অনুসারেই হোক। এই সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ে, ছোট এবং বড়, সব-ই তাঁর কাছে অপিত হোক।’

জাপানের শাসকশ্রেণীর এই আচরণের সঙ্গে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর কোন অংশে তুলনা করা যায়? একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্ভাগ্যবশত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস আজও ভারবর্ষের ইতিহাসে রচিত হয়নি। কিন্তু যারা এদের কিছুমাত্র জানেন, তারা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ত্যাগের কোনও সদিচ্ছা এমন কি ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজস্বার্থ উৎসর্গ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নেই। যদিও এই শাসকশ্রেণীই স্বাধীনতার তৃষ্ণায় কাতর, তবুও এই স্বাধীনতার জন্য তারা তাদের স্বার্থ ত্যাগের কথা স্বপ্নেও ভাবে না। তাদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য তারা দু’টি অস্ত্র প্রয়োগ করে চলেছে। প্রথম অস্ত্রটির নাম জাতীয়তাবাদ। যখনই শোষিতশ্রেণীর মানুষ সংসদ, প্রশাসন এবং জন-কৃত্যকে সংরক্ষণের দাবি তুলছে, বিপন্ন জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে তখন-ই শাসকশ্রেণী এর বিরোধিতা করে চলেছে। এই সংরক্ষণ কিসের জন্য? সংক্ষেপে বলা যায়, এই সংরক্ষণের ফলে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামে পায়ের নিচের সামান্য জমি শাসকশ্রেণী কেড়ে নিতে পারবে না। এই সংরক্ষণের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই এবং এ দাবি জানানো কোনও অন্যায নয়।

এই দাবির প্রতি শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া কি? শাসকশ্রেণী এই দাবিকে শ্লেষ এবং ব্যঙ্গমিশ্রিত বিরোধিতা করতে কোন সুযোগ হাতছাড়া করে না। সাধারণ মানুষকে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য করাচ্ছে যে, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন ঐক্য। সংসদ, প্রশাসন ও জন-কৃত্যকে সংরক্ষণের দাবি তুলে ঐক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা চলছে। স্বাধীনতার মুখের দিকে তাকিয়ে এই দাবি জানানো পাপের মতো গহ্বত কাজ। এই হল ভারতের শাসকশ্রেণীর মনোবৃত্তি। জাপানি শাসকশ্রেণীর সঙ্গে এর আকাশ পাতাল বিভেদ। এখানে জাতীয়তাবাদের অপপ্রয়োগ করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর চেতনার উন্মেষ হয় না। সংরক্ষণের দাবি নিয়ে ব্যঙ্গ-রচনা এবং ব্যক্তিগত বিদ্ৰূপাত্মক রচনায় শাসকশ্রেণীর অনেক সম্মানীয় সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এমনকি আধুনিক মনস্ক, বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় হাই-কমিশনার ডঃ আর. পি. পরাঞ্জপে, এ ধরনের ব্যঙ্গ-রচনা^১ লেখা থেকে নিজেকে বিরত রাখার লোভ সামলাতে পারেন নি। যে সমস্ত ব্যঙ্গ-রচনা শাসকশ্রেণীর সদস্যরা রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে তাঁর লেখাটিই ছিল রসালো এবং প্রকাশ হওয়া মাত্রই শোষিতশ্রেণী থেকে তীব্র বিক্ষোভের বাড় ওঠে।

১. ১৯২৬ সালের মে মাসে গুজরাটি—‘পুন্ড’ পত্রিকায় ‘ভবিষ্যতের ঝাঁকি দর্শন’ শিরোনামে ডঃ আর. পি. পরাঞ্জপে একটি ব্যঙ্গ-রচনা লেখেন। শাসকশ্রেণীর সদস্যদের দ্বারা লিখিত ব্যঙ্গ-রচনার উদাহরণ স্বরূপ এটি পাঠ করা যায়। সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা কিছু ঘটনা নিয়েই এই ব্যঙ্গ-রচনা। পত্রিকাটি যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, তাই সকলকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যঙ্গ-রচনার পুরোটাই আমি পুনরায় উপস্থাপন করছি—

‘এ পীপ ইনটু দ্য ফিউচার’

(ভবিষ্যতের ঝাঁকি দর্শন)

নিম্নে উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশগুলি ১৯৩০-৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট, পুলিশে নথিভুক্ত মামলা, ফৌজদারি মামলা, পর্যদের কার্যবিবরণী, পরিচালন সমিতির প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে ‘গুজরাটি গল্পে’র পাঠকদের জন্য প্রকাশিত।

I

ভারত সরকারের ওপর রয়াল কমিশনের প্রতিবেদন, ১৯৩০।

ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে প্রতিনিবিত্ব ঘটেছে, তা ঘনিষ্ঠ ভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। বিগত আদমশুমারির পরিসংখ্যানকে ভিত্তি ধরে নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে উত্থাপিত প্রশ্নও দাবিগুলির একটা আপাত সন্তোষজনক জবাব আমরা দিতে পারি। যেহেতু বহু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য কোনও অভিন্ন ব্যবস্থা নেই, যেহেতু দেশের প্রতিটি মানুষকেই পরিচালন ব্যবস্থার সদস্য করা সম্ভব হচ্ছে না, সেহেতু সমস্যার সটিক নিরঙ্কুশ সমাধানে কোনও নিখুঁত সরকারি ব্যবস্থাও গড়ে তোলা সম্ভব না।

শাসকশ্রেণী মনে করে যে শোষিত শ্রেণীর সংরক্ষণে দাবি মেনে নেওয়া হলে, যোগ্যতার প্রতি অমর্যাদা করা হয়। তারা ভারতীয়দের বুঝাচ্ছে যে, যোগ্য লোক ছাড়া প্রশাসন চালানো স্বাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে। বিদেশিরা এই যুক্তির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী ছায়া রয়েছে, তা দেখেই এই যুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমালোচনা না করেই সমর্থন করছে। সুতরাং এই যুক্তির গ্রহণযোগ্যতা এবং যুক্তবাদীদের নীতি নিষ্ঠতা বিচার করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

সংবিধানে আমরা ২৩৭৫ টি মৌলিক ধারার সংস্থান রেখেছি এবং প্রতিবেদনের ধারাতেও দেখা যাচ্ছে যে, বহু সংখ্যক সম্প্রদায়ের স্বার্থে তাকে নানা ভাবে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের তাহলে এখন থেকে দাবি হবে, তাদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব, চাকরি, বিভিন্ন সংগঠনে সদস্য হওয়া এবং দেশের যত সংস্থা আছে সর্বত্র তাদের প্রতিনিধিত্ব মানতে হবে। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭৫ জন সদস্য প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের এক পঞ্চমাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তিনজন সদস্য এক বছরের জন্য এই পরিষদের কার্যভার গ্রহণ করবে যাতে পাঁচ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সব সদস্যের সঠিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ঘটে। প্রধান বিচারালয়ে (High Court) থাকবেন ১২৫ জন বিচারপতি। প্রত্যেকে তাঁর পদে এক বছরের জন্য আসীন থাকবেন যদিও ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সঠিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ঘটবে ১৯ বছর পর পর। ঠিক এই ভাবে সব সম্প্রদায়ের সব দাবির যথার্থ ভাবে মেটানোর ক্ষেত্রেও এই এক-ই নিয়ম-বিধি প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং এতগুলি সরকারি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায়ের বিপুল প্রতিনিধিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন মতো স্থান সংকুলানের জন্য সরকারি ভবন ভাঙতে হবে এবং নব কলেবরে বিপুল আকারে গড়তে হবে।

II

ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি—১৯৩২

১৯৩১ সালের 'ভারত শাসন আইন'র সংস্থান অনুযায়ী মহামহিম রাজা বাহাদুর সম্রাট অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসাবে নিয়োগ করেছেন—

২৬৭) মাতাদিন রামদিন (জাতে নাপিত) : চিকিৎসা বিভাগের শল্য চিকিৎসা শাখার ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

৩৭২) আল্লাবক্স গীরবক্স (মুসলমান উষ্ট্রচালক) : সেনাবিভাগের উষ্ট্র পরিবহন শাখার ভারপ্রাপ্ত।

৪৩৩) রামস্বামী (অস্ত্রের জমাদার) : পূর্ত বিভাগের অধীন সড়ক সাফাই শাখার ভারপ্রাপ্ত।

৪৩৭) জগন্নাথ ভট্টাচার্য (কুলীন ব্রাহ্মণ পুরোহিত) : নিবন্ধীকরণ বিভাগের গৃহ সংক্রান্ত শাখার ভারপ্রাপ্ত।

IV

স্থানীয় সরকারগুলির প্রতিপত্র, ১৯৩৪

আইনসভায় সরকারের পূর্ণ সমর্থন ও সহমতক্রমে যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে এই মর্মে নির্দেশ দিতে বলা হয়েছে যে, এখন থেকে সরকারের অধীনে কোনও নিয়োগ পর্যায়ক্রমে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ও তাদের আবেদনের যোগ্যতা নির্বিশেষে কার্যকর করতে হবে।

যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে বা যোগ্যতাকে অস্বীকার করে কোনও কাজ করাটা নিশ্চয়-ই সু-বিবেচকের পরিচয় বহন করে না। সবচেয়ে যোগ্য লোককে বাদ দিয়ে তার পরবর্তীদের নেওয়া মানে যোগ্যতার মান কমে যাওয়া। একথা নিয়ে কোনও দ্বন্দ্ব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, ভারতের ইতিহাসে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্যতম ব্যক্তিটি শাসক শ্রেণীভুক্ত, তখন এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না।

V

বোম্বাই সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ১৯৩৪

বোম্বাই সরকার ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি কার্যকর করতে চলেছে। সরকারি নির্দেশনামা (৩০ নভেম্বর, ১৯৩৪) অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত সম্প্রদায় থেকে আবেদনকারীদের নিয়ে গড়তে হবে।

- ১। সেচের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার (সিদ্ধ): উত্তর কর্ণটকের কৃনবি থেকে।
- ২। সংস্কৃত অধ্যাপক, এলফিনস্টোন কলেজ, বোম্বাই : সিদ্ধ থেকে বালুচি, পাঠান।
- ৩। মহামহিমের দেহরক্ষীর নির্দেশক, উত্তর ওজরাটের মারোওয়ার থেকে।
- ৪। স্থাপত্য বিষয়ে সরকারের পরামর্শদাতা : দাক্ষিণাত্যের ওয়াদরি (ভবঘুরে জিপসি)।
- ৫। ইসলামি সংস্কৃতির অধিকর্তা : কারহাদ ব্রাহ্মণ
- ৬। অস্থি-বিষয়ক অধ্যাপক : (গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজ) জনৈক মুসলিম কসাই।
- ৭। ইয়েরাভদা জেলের সুপার : ঘন্টিচোর।
- ৮। মদ্যপান নিষিদ্ধকারী দুই সংগঠন : ধরলা (খেড়া ডিসট্রিক্ট ভিল), (পাঁচ মহল)।

VI

প্রধান বিচারালয়ের একটি মামলার রিপোর্ট ১৯৩৫

ক, খ, (জাত. তেলি) ঘুমন্ত অবস্থায় পিতাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের দায়ে অভিযুক্ত। বিচারক তার রায় দানে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। দণ্ড ঘোষণার আগে বিচারক অভিযুক্তের উকিলের মাধ্যমে জানতে চান, তার কিছু বলার আছে কি না। উকিল শ্রী বোমানজি বলেন যে, তিনি আদালতের রায়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু আইন অনুযায়ী অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের চাইতেও লঘু কোন দণ্ড দেওয়া যাবে না কারণ এই বছর সাতজন তেলিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে দুজনকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী এমন অনেক সম্প্রদায় আছে যাদের দণ্ড প্রাপ্তির কোটা এখনও পূর্ণ হয় নি। অথচ তেলি অপরাধীদের ক্ষেত্রে তা পূরণ হয়েছে। মহামান্য আদালত এই যুক্তি স্বীকার করে নেন এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে রেহাই দেয়।

শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি হয়তো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শোষিতশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি কি তা মেনে নিতে পারে? শ্রেষ্ঠ জর্মন কি কখনও ফরাসিদের জন্য শ্রেষ্ঠ হতে পারে? শ্রেষ্ঠ তুর্কি কি কখনও গ্রিকদের জন্য শ্রেষ্ঠ হতে পারে? শ্রেষ্ঠ পোল কি কখনও ইহুদিদের জন্য শ্রেষ্ঠ হতে পারে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় দুটি বিষয় এড়িয়ে গেলে চলবে না। এক, একজন মহান ব্যক্তি, সৎ নাও হতে পারেন। দুই, মানুষ কিন্তু বিবেক ও অনুভূতি বর্ধিত যন্ত্র নয়। যোগ্যতম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সত্য। তারও শ্রেণীভক্তি বা শ্রেণী ঘৃণা থাকতে পারে। এ সবার নিরিখে, শাসকশ্রেণী থেকে নির্বাচিত যোগ্যতম ব্যক্তিটি, শোষিতশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিকৃষ্টতম হতে পারে।

VII

‘ইন্ডিয়ান ডেইলি মেল’ পত্রিকার অংশবিশেষ ১৯৩৬

আম্বাজি রামোচন্দ্র (চিৎপবন ব্রাহ্মণ) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরি হাতে পুনার রাস্তায় ঘোরা-ফেরা করতে দেখা যায়। যখন তাকে ধরে নিয়ে জেলা-শাসকের সামনে হাজির করা হয়, তখন পুলিশ জানায় যে, তাকে সম্প্রতি মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে। ঐ হাসপাতালের সুপার সাক্ষাদানের সময় বলেছেন, একজন বিপজ্জনকে উন্মাদ হিসাবে আম্বাজি তাদের হাসপাতালে তিন বছর ছিলেন। কিন্তু চিৎপবন ব্রাহ্মণদের আসন সংখ্যা যেহেতু সংরক্ষিত এবং অন্য সম্প্রদায়ের উন্মাদরা যেহেতু ঐ হাসপাতালে তাদের সংরক্ষিত আসনের কোটা পূরণ করেনি, সেহেতু ঐ ধৃত উন্মাদকে আরও বেশিদিন ঐ হাসপাতালে রেখে পক্ষপাত করা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকারের চিকিৎসা দপ্তরের নির্দেশানুসারে ঐ উন্মাদ চিৎপবন ব্রাহ্মণকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা-শাসক আম্বাজিকে বেকসুর খালাস করে দিলেন।

VIII

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কারা প্রশাসনের রিপোর্টের অংশ বিশেষ, ১৯৩৭

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কারাগারে কিছুতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত কোটা সংরক্ষিত আসনের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যাচ্ছে না। ঐ বৈষম্য দূর করার জন্য জেল-সুপার ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে বিশেষ নির্দেশ চেয়েছেন।

সরকারের প্রস্তাব: সরকার কারা বিভাগের আই. জি.-র কর্তব্যের প্রতি অবহেলায় যার পর অসম্ভব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে জেলের সংরক্ষিত আসন পূরণে সামঞ্জস্য আনতে হবে। তবে যথেষ্ট সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজনে বেশ কিছু সংখ্যক বন্দীকে ছেড়েও দিতে হবে।

শুধুমাত্র যোগ্যতাকে বিচারের মাপকাঠি হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। তাই যদি হত, তবে ফরাসিদের যাবতীয় কার্যকলাপ, জার্মানরা নিয়ন্ত্রণ করত বা তুর্কিদের রাজারা এবং চিনেদের জাপানিরা। যারা শুধুমাত্র এই যোগ্যতার তত্ত্বটিকে যোগ্য প্রশাসনের উপযুক্ত মাপকাঠি বলে মেনে নেন, তারা ফরাসি, তুর্কি ও চিনেদের এই তত্ত্বের প্রয়োগ ও ফলাফল সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করুন। যে কোনও লোকের কাছেই এদের উত্তরটা জানা। আমি নিশ্চিত যে, সকলেই এই তত্ত্বের আবাস্তবতা মেনে নেবেন। তাহলে ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে শাসকশ্রেণী ও শোষিতশ্রেণীর সম্পর্ক ফরাসি এবং জার্মান, তুর্কি এবং রশ, বা চিনে এবং জাপানিদের পার্থক্যের মতো, সেখানে এই তত্ত্বের কি করে প্রয়োগ সম্ভব হবে। বাস্তবে, ভারতের শাসকশ্রেণী

IX

আইনসভার কার্যবিবরণী, ১৯৪০

শ্রী চেম্বালা জানতে চান: সরকার কি জানেন যে, পালি বিষয়ের এম-এ পরীক্ষায় মান্গারুভিদের জন্য যে কোটা নির্দিষ্ট আছে ফলাফলে তা প্রতিফলিত হয়নি? মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী দামু শ্রফ প্রত্যুত্তরে বলেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে মাও-গারুভি সম্প্রদায় থেকে কেউ-ই এবার পরীক্ষায় বসে নি। শ্রী চেম্বালা : এই অবস্থায় সরকার কি ততদিন পরীক্ষা স্থগিত রাখবেন, যতদিন ওই সম্প্রদায়ের পরীক্ষার্থী না পাওয়া যাচ্ছে? এমন কি এই পরীক্ষা বন্ধের নির্দেশ যদি অমান্য করা হয় তাহলে কি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে তার অর্থ মঞ্জুরি প্রত্যাহার করে নেবেন এবং সংশ্লিষ্ট আইন কি সংশোধন করবেন? মাননীয় সদস্য, সরকার সানন্দে এই প্রস্তাব বিবেচনা করবে। (উৎফুল্ল ভাব)।

X

দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার অংশ বিশেষ ১৯৪২

‘তদন্তকারী আধিকারিক শ্রী কে. জে. জে. হসপিটালে রামজি সোনির অস্ত্রপচারের সময় তার মৃত্যুর ঘটনার সম্পর্কে তদন্তের জন্যে ডাকা হয়েছিল। ডাঃ তনু পাণ্ডব (জাতে নাপিত) স্বীকার করেন যে, তিনি এই অস্ত্রপচারের তদারকি করেন। তিনি রোগীর তলপেটে যে কৌড়া হয়েছিল, সেটি কাটতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অস্ত্রপচারের সময় ছুরিটি ঢুকে যায় রোগীর বুকে এবং সে মারা যায়। এই এক-ই ধরনের রোগীর অস্ত্রপচার তিনি আগে করেছেন কি না জানতে চাওয়া হলে চিকিৎসক বলেন যে, তার সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট পদ পূরণের সময় নির্ধারিত সময় আসার একদিন আগে তাকে এই হাসপাতালের শল্য চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এর আগে দাড়ি কামানোর জন্য রেজার ব্যবহার করা ছাড়া তিনি কখনই ছুরি কাঁচি ধরেন নি। বিচারক শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করে নেন।

নিজস্বার্থে অন্ধ হয়ে যোগ্যতার এই অবাস্তব যুক্তিটি ভাল করে বিচার করে দেখছেন না। তারা জানে যে, ক্ষমতার বলে তারা এই মতকে আইনসিদ্ধ করতে পারে। সুতরাং শোষিতশ্রেণীর মতামতকে আমল দেওয়ার প্রয়োজন-ই বোধ করে না।

শাসকশ্রেণী কিভাবে ক্ষমতায় এসেছে তা নিয়ে তারা আদৌ চিন্তিত নয়। এরা তার প্রয়োজনও বোধ করে না। এরা মনে করে যে, যোগ্যতার দরুণ এরা সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং যে-ভাবেই তারা এই আসনে পৌঁছুক না কেন, শোষিতশ্রেণীর ওপর অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার এদের আছেই।

কিন্তু শাসকশ্রেণী কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে? আশ্চর্যের মনে হলেও তারা কিন্তু সংরক্ষণের ভিত্তিতেই সর্বোচ্চ আসনে পৌঁছাতে পেরেছে। এই সত্য মেনে নিতে অনেকের হয়তো অসুবিধা হবে। তারা হিন্দুদের বাইবেল মনুষ্যত্ব পড়ে দেখতে পারেন। সেখান থেকে তারা জানতে পারবেন যে, শাসকশ্রেণীর প্রধান-ব্রাহ্মণেরা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার জোরেই রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করেছিল। সেক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার যোগ্যতা অনুযায়ী তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসেনি। মনুষ্যত্বতে উল্লেখ আছে যে পুরোহিত, রাজ পুরোহিত এবং আচার্য, মুখ্য বিচারক এবং বিচারালয়ের বিচারপতিরা এবং রাজার মন্ত্রীর সকল পদ-ই ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এমনকি প্রধান সেনাপতির পদটি ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত করার কথা উল্লিখিত হলেও বাস্তবে তা হত না। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্রাহ্মণদের অধিকারে থাকার জন্য সব মন্ত্রীত্বের পদগুলিও স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা এবং সুবিধাভোগী আসনগুলি সংরক্ষণ করেও ব্রাহ্মণরা তৃপ্ত ছিল না। তারা জানত যে, শুধুমাত্র সংরক্ষণ করলেই চলবে না। অ-ব্রাহ্মণ সাম্প্রদায়কে যোগ্যতা অর্জন করার ও সংরক্ষণের প্রথাকে বিলুপ্ত করার থেকে যেন-তেন প্রকারে বিরত করতে হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষণ করা ছাড়াও শিক্ষার অধিকার শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত রাখার নিয়ম চালু হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে কোন শূদ্র বা হিন্দু সমাজের নীচুবর্ণের কোনও মানুষ যদি শিক্ষা গ্রহণ করত, তবে শাস্তিস্বরূপ তার জিভ কেটে নেওয়া হত এবং কানে গরম সিসে ঢেলে দেওয়া হত। তবে একথা সত্যি যে, ব্রিটিশ শাসনে এই নিয়মের আর অস্তিত্ব নেই। তবুও সংরক্ষণের যে নিয়ম মনু প্রবর্তন করেছিলেন, তা আজ বিলুপ্ত হলেও দীর্ঘ সময় ধরে তা প্রচলিত হওয়ার ফলে এই নিয়মের সুযোগ-সুবিধা কিন্তু রয়েই গিয়েছে। সংরক্ষণের দাবি করে শোষিতশ্রেণীরা কিছু অসাধারণ বা নতুন কথা বলছেন। শাসকশ্রেণীর আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষিত করার ও শূদ্রদের ওপর আধিপত্য অটুট

রাকার জন্য এই দাবি। কিন্তু এর জন্যে ব্রাহ্মণদের ওপর কোনরকম অযৌক্তিক শর্ত আরোপ করা তাদের অভিপ্রায় নয়। যেমন শাসকশ্রেণীর শিক্ষা বা সম্পদের অধিকারকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা তাদের অভিপ্রায় নয়।

জনকল্যাণের ক্ষেত্রেও যোগ্যতার এই তত্ত্বটি ভেবে দেখা উচিত। আয়ারল্যান্ডের হাউস অফ কমন্স-এর ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান এক বিতর্কে বলেছিলেন যে, ভাল সরকারের থেকে স্বায়ত্তশাসন অনেক ভাল। ভারতে এই উক্তিটি শ্রোগানের থেকেও বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। এটিকে প্রবাদ রূপে মানা হত। কিন্তু এই উক্তিটি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান ভাল সরকারের সঙ্গে কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের তুলনা করছিলেন না। তিনি আসলে যোগ্য সরকার বা তার প্রতিপক্ষ লর্ড সলিসবেরির কথায় স্থিতিশীল সরকারের সঙ্গে তুলনা করছিলেন। স্বায়ত্তশাসন যদি ভাল না হয় তবে তার অস্তিত্ব অর্থহীন। অতএব, এখন দেখতে হবে যে, একটা ভাল সরকার কিভাবে গঠন করা যায়। অনেকের ধারণা, স্বায়ত্তশাসন যেহেতু সার্বভৌম সরকার গঠন করে, অতএব তা ভাল সরকার হতে বাধ্য। পরাধীন দেশগুলিতে এই মারাত্মক বিভ্রম মানুষকে রোগগ্রস্ত করে তুলেছে। যারা এখনও বিভ্রান্ত তারা এ বিষয়ে অধ্যাপক ডাইসির মত পড়ে দেখতে পারেন। ব্যক্তি বা সংগঠনকে সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা দিলে, তার ফল কি হতে পারে সে সম্পর্কে অধ্যাপক ডাইসি বলেছেন—

‘যে কোনও সার্বভৌম শাসকেরও সংসদের ক্ষমতার প্রয়োগ দুটি সীমাবদ্ধতায় বাঁধা। একটি বাহ্যিক এবং অপরটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ।’

‘সার্বভৌম শক্তির বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের দরুন তার অধীনস্থ সকলেই বা অনেকাংশই আইন অমান্য বা প্রতিরোধ করতে পারে।’

‘এই নিয়ন্ত্রণ চরম স্বেচ্ছাচারিত্ব হতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রোমান সম্রাট বা ফরাসি রাজা বর্তমান যুগের জারের মত স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। দেশের আইন এবং শাসনব্যবস্থার এরাই ছিলেন সর্বময় কর্তা। এদের প্রণীত আইন মানতেই হত। এই আইন অমান্য করার মতো কোন শক্তি সেই সাম্রাজ্যে ছিল না। কিন্তু চরম স্বেচ্ছাচারী শাসক বাস্তবে নিজের ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করতে পারতেন না—

‘শাসক, তা সে যত স্বেচ্ছাচারী হোক না কেন, তাকেও তাঁর প্রজাদের কিছু অংশের সম্মতির ওপর নির্ভর করতে হত। অবশ্য তৎক্ষণাৎ হয়ে যাওয়া প্রজাদের সংখ্যা সীমিত ছিল। ইতিহাসের অনেক কুখ্যাত ঘটনা এর সাক্ষ্য বহন করে। পূর্বের কোনও সিজারের পক্ষে রোমান জগতের উপাসনার রীতিকে ইচ্ছানুযায়ী ধ্বংস

করতে পারেনি.....

সুলতান মুসলমান রীতিকে নাশ করতে পারে নি। ক্ষমতার শিখরে থাকা চতুর্দশ লুই নাস্তের নির্দেশ বাতিল করতে পারত, কিন্তু তাহলে প্রোটেষ্ট্যান্ট মতবাদকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হতেন, এবং এক-ই কারণে দ্বিতীয় জেমস্ রোমান ক্যাথলিক মতবাদকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারেন নি.....স্বৈরাচারী শক্তি, সাংবিধানিক পরিষদের শাসন এবং বিশেষজ্ঞ সার্বভৌম সংসদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণ চারিদিক থেকে কার্যকরী হতে পারে। উপনিবেশগুলির ওপর সংসদ আইনত কর আরোপ করতে পারে। আইন ভঙ্গ না করেও রাজশাসন বিলুপ্ত করা বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। কিন্তু বিশ্বের পরিস্থিতির নিরিখে ব্রিটিশ সংসদ যে এ ধরনের কোন কাজ করতে পারে না, তা সর্বজনবিদিত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়ন করা সত্ত্বেও যে বিপুল বিরোধিতার ঝড় উঠবে, সংসদীয় ক্ষমতা দিয়ে তা সমালোচনা অসম্ভব।

‘সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। প্রতিটি স্বৈরাচারী তার চরিত্র অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। তার চরিত্র গঠিত হয় সেই সময় এবং সমাজের নৈতিকবিশিষ্ট পরিমণ্ডলে। সুলতান চেষ্টা করলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবেন না। মুসলমানদের শীর্ষস্থানীয় কর্তা হয়ে তিনি যদি তাদের ধর্ম পরিবর্তন করতেন তবে তা মহম্মদের ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ হত। সুতরাং এটি একটি অসম্ভব বা চরম অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সুলতানের ক্ষমতার ওপর এই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের থেকে কোন অংশে কম নয়। প্রায়শঃই অনেকে অহেতুক জানতে চান যে, পোপ কেন নতুন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করছেন না। আসলে পোপ যে বিপ্লবী নন এ কথাটা তারা ভুলে যান। যে মানুষ পোপ হন, তার চোখে কখনও বিপ্লবের স্বপ্ন থাকে না।’

দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব অর্জন করেও শোষিতশ্রেণী নিশ্চিত থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর পরিচয় জানাও তাদের পক্ষে জরুরি।

ডাইসির মতবাদে যে তর্কাতীত সত্য রয়েছে তার থেকে বলা যায়, শাসকশ্রেণীর যোগ্যতা এবং সক্ষমতা ভাল সরকারের মাপকাঠি নয়। শাসকশ্রেণীর সদৃচ্ছা থাকা অত্যন্ত জরুরি। ডাইসি বলেছেন, শ্রেণীস্বার্থের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা থেকে শাসকশ্রেণীর মুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভাল সরকারের পরিবর্তে, যোগ্যতা ও শ্রেণীস্বার্থ স্বার্থপর শাসক শ্রেণী গড়ে তোলে। তাহলে শোষিতশ্রেণী চিরকাল নিপীড়নের

যাঁতাকলে আবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শ্রেণী পক্ষপাতকে অগ্রাহ্য করা যায় না। ভাল সরকার গঠনের এটাই হল প্রথমিক শর্ত। দুর্ভাগ্যবশত, যারা নিজেদের গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করেন, তারাও এই বিষয়টির দিকে দৃকপাত করতে ভুলে যান। পারি কমিউনের পরিচালন ব্যবস্থায় কার্ল মার্ক্স সর্বপ্রথম এটি লক্ষ্য করেন। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারের ভিত্তি যে এর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতে শেষিত শ্রেণী এই ভিত্তির ওপরেই সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছে। একমাত্র শোষিতশ্রেণীর মানুষ-ই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে পারে। বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে যোগ্যতার অভ্যুত্থানে তাকে বাতিল করা চলবে না। ভারতের শাসকশ্রেণী যদি শুধুই যোগ্যতার স্বপক্ষে অটুট থাকে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, সরকারি শাসনতন্ত্রে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার স্বার্থপর মনোভাব আছে।

IX

এই দীর্ঘ আলোচনার ফলে বিদেশি বন্ধুরা হয়তো মূল বক্তব্যগুলি ভুলে যেতে পারেন। সেগুলি পুনরায় একত্রিত করে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল সমস্যা : (১) শাসকশ্রেণীর অবস্থান,

(২) শোষিতশ্রেণীর প্রতি শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, (৩) শোষিতশ্রেণীর সাংবিধানিক সুরক্ষা দাবি করার কারণ এবং (৪) কংগ্রেস ও শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শাসকশ্রেণীর থেকে ভারতের শাসকশ্রেণীর অবস্থানগত পার্থক্য ব্যাপক। এই পার্থক্য সহজবোধ্য নয়। সহজে একে ব্যক্ত করাও যায় না তবুও উদাহরণস্বরূপ ‘বার’ এবং ‘হাইফেনের’ তফাৎ একটা পরিষ্কার ধারণা দিতে সাহায্য করতে পারে। তফাৎটা সবার-ই জানা। একটি ‘বার’ বিচ্ছেদ করে কিন্তু যুক্ত করে না; কিন্তু একটি ‘হাইফেন’ বিচ্ছেদ এবং যুক্ত দুটোই করে। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী এবং শোষিতশ্রেণী একটি ‘বার’ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অন্যান্য দেশে এদের মাঝে একটি হাইফেন থাকে। এই পার্থক্যজাত ফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ক্রমাগত আদান-প্রদানের ফলে সমুন্নত মানুষরা শোষিতশ্রেণীতে যুক্ত হন। কিন্তু ভারতবর্ষে বংশোদ্ভূত না হলে এই সংকীর্ণ শাসকশ্রেণীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। অন্যান্য দেশের শাসকশ্রেণী এতটা রক্ষণশীল নয়। অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সামাজিক এবং মানসিক আদান প্রদান হওয়ার দরুন

শোষিতশ্রেণীর প্রতি শাসকশ্রেণীর বৈরি মনোভাব এতটা প্রকট নয়। অর্থাৎ ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের শাসকশ্রেণী সমাজবিরোধী নয়। তারা শুধুমাত্র অসামাজিক। ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণীর সংকীর্ণতার জন্য তাদের সংস্কার, সমাজ-দর্শন ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শোষিতশ্রেণীর প্রতি অপরিবর্তিত বিরোধী মনোভাব বর্তমান। এই মনোভাব এতটাই গভীর এবং এতই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, শাসক এবং শোষিত, সুবিধাভোগী এবং নিপীড়িত শ্রেণীর পার্থক্য প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে। এর থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ভারতের শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র অসামাজিক নয়, তারা ভীষণভাবে সমাজ বিরুদ্ধও বটে।

শোষিতশ্রেণীর সংরক্ষণের দাবি তোলার উদ্দেশ্য প্রশাসনের শাসনতন্ত্রে ও শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা। শাসকশ্রেণী অবশ্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে হয়ে প্রতিপন্ন করে শোষিতশ্রেণীর কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। আসলে আমেরিকানরা যাকে সাংবিধানিক রোধন ও সমন্বয়ন (Checks and Balances) বলেন সেই একই উদ্দেশ্যের জন্য শোষিতশ্রেণীর এই সংরক্ষণের দাবি তুলেছে। গণতন্ত্রকে তার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য। আমেরিকানদের নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শোষিতশ্রেণীর সংরক্ষণের দাবির পরিকাঠামোগত পার্থক্য থাকলেও, চারিত্রিক দিক থেকে উভয়-ই সমান। দুদিক থেকে আমেরিকানরা সংবিধানের ও ভারসাম্য রক্ষা করে। প্রথমত দেশের রাজনৈতিক সংবিধান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা জরুরি। একেক দেশে একেক রকম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়ার দরুন রাজনৈতিক সংবিধানের নিয়ন্ত্রণও সেই অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে দেশে জাতি বিদ্বেষ সমাজের রক্তে রক্তে, সে দেশের নিয়ন্ত্রণের রীতি গণতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণের রীতি থেকে আলাদা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত, শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে শোষিতশ্রেণীর ওপর নিষেধণ রোধ করার জন্য তাদের ভিতকে মজবুত করার প্রয়োজন। কোনও কোনও দেশে শাসকশ্রেণীকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার শোষিতশ্রেণীর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষে শাসকশ্রেণী এতটাই ক্ষমতাবান এবং সর্বগ্রাসী যে শোষিতশ্রেণীর আত্মরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ছাড়াও অন্যান্য সাংবিধানিক হাতিয়ার দেওয়া উচিত। এই বিশ্লেষণের নিরিখে বিদেশিরা নিশ্চয়-ই বুঝতে পারছেন যে, আমেরিকান সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শোষিতশ্রেণীর সংরক্ষণের দাবির উদ্দেশ্যগত ফারাক প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং, এই দাবির প্রতি বিরূপ পারনা পোষণ করার আগে তারা একটু ভাল করে ভেবে দেখবেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর সম্পর্ক নানান তথ্যের সাহায্যে আগেই তুলে ধরা হয়েছে। এইসব তথ্য থেকে বিদেশিরা উভয়ের সম্পর্কের নিবিড়তার চিত্রটি পরিষ্কার দেখতে পাবেন। এই তথ্য থেকেই কংগ্রেসের সংগ্রামের প্রতি শাসকশ্রেণীর ছত্রধরের ভূমিকাটি পরিষ্কার হয়ে যায়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রেণীতত্ত্ব ও শ্রেণীসংঘাত নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার শাসকশ্রেণীর মৃত্যুঘন্টা বাজাতে পারে—এ সত্য শাসকশ্রেণী মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। তারা জানে, শোষিতশ্রেণীদের জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে প্রতারণা করা সবচেয়ে ফলপ্রসূ পন্থা। শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য নিশ্চিত হয়েই কংগ্রেসকে সমর্থন করে। তারা ভালোই জানে যে একমাত্র কংগ্রেস গরিব এবং বড়লোক, ব্রাহ্মণ এবং অ-ব্রাহ্মণ, বাড়িওয়ালা, ভাড়াটে, মহাজন ও ঋণী, সকলের সংঘাত নিয়ে শাসকশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করতে প্রস্তুত। একমাত্র কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেই শাসকশ্রেণীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐক্যের দোহাই দিয়ে অন্য সমস্ত মতবাদকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।

এরপর বিদেশিদের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কংগ্রেস মার্কাস্ত্রাজের প্রতি শোষিতশ্রেণীর কেন আকৃষ্ট হচ্ছে না? কংগ্রেসের এই স্বরাজের তকমা তাদের কীভাবে ভাল করতে পারে? তারা জানে যে কংগ্রেসের স্বরাজের আমলে তাদের উন্নতির আশা অত্যন্ত ক্ষীণ। কংগ্রেসি স্বরাজে হয় তথাকথিত গান্ধীবাদের বাস্তব প্রয়োগ নয়ত শাসকশ্রেণীর মর্জি মার্কিনিক সবকিছু চলবে। যদি গান্ধীবাদের প্রয়োগ হয় তবে ঘরে ঘরে চরকা কাটা হবে, গ্রামীণ শিল্প তৈরি হবে, জাত-পাত মানা হবে, ব্রহ্মচর্য, গো-আরাধনা প্রভৃতি ঘটনা প্রধান্য পাবে। যদি শাসক শ্রেণীর স্বরাজের সময়কার কার্যবিধি ঠিক করে, তাহলে তারা প্রথমেই শোষিত শ্রেণীকে দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধাগুলি কেড়ে নিয়ে শোষণের পথকে সুগম করবে।

অনেকেই আশাবাদী যে, স্বরাজের সময়ে ভাড়াটে আইন, কারখানা আইন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, মুদ্রা ব্যবস্থার উন্নতি, ওজন ও পরিমাপের বিধিবদ্ধকরণ, চিকিৎসালয় এবং শোষিত শ্রেণীর সুবিধার্থে এসব ছাড়াও আরও অনেক কিছুর উন্নতি ও সংস্কার ঘটানো হবে। আমি কিন্তু এতটা আশাবাদী নই। অনেকেই ভুলে যান যে, কংগ্রেস আসলে এসব প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে নিজেদের ব্রিটিশ শাসকদের থেকে ভালো ভাবমূর্তি গড়তে চাইছে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসান ভুলে এই সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তো? প্রথমত এসবের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে মহত্বের

কিছু নেই। আজকের দিনে পৃথিবীর কোনও শাসক শ্রেণী যে কোনও সভ্য সমাজে পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে পারে না। তাছাড়া, স্বরাজের উদ্দেশ্য কি শুধুই সমাজের মান উন্নত করা? শোষিত শ্রেণীর, আমি যতদূর জানি, কোন দোষ নেই। তারা শুধুমাত্র দু-মুঠো খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা যুগ যুগান্ত ধরে যে পৈশাচিক সমাজ-ব্যবস্থায় অপমানিত হয়ে চলেছে, তার তুলনায় তাদের দারিদ্র্য কিছুই নয়। তারা শুধু খাদ্য নয়, সম্মানও চায়। শাসক শ্রেণী যখন বিলুপ্ত হবে এবং অদৃষ্ট নির্ধারণ করা বন্ধ করবে, সেই সময় থেকে এরা সম্মানে বাঁচতে পারবে। শোষিত শ্রেণী নানাবিধ পরিকল্পনায় আগ্রহী নয়। তারা শুধু জানতে চায় যে, শাসক শ্রেণী ক্ষমতা দখলের পরে এমন কি কোনও সামাজিক উন্নতির পরিকল্পনা নেবে যাতে সমাজ থেকে শাসক শ্রেণী বিলুপ্ত হয়? এর উত্তর একটাই। ভারতের সংবিধানে শোষিত শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সুরক্ষা থাকবে কি থাকবে না—তার ওপরেই এসব নির্ভর করছে। যদি সাংবিধানিক সুরক্ষা থাকে তবে ক্রমে ক্রমে শোষিত শ্রেণী শাসক শ্রেণীর বিলোপ সাধন করতে পারবে। সাংবিধানিক সুরক্ষা যদি না থাকে, তবে অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এই বিষয়কে সামনে রেখে বিদেশিরা লক্ষ্য করবেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র বহুল বিজ্ঞাপিত হলেও তা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। কংগ্রেস প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হতে পারে, হয়তো তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তবুও এসব কিছুই মূল বিষয়ের সমাধান করতে পারে না। কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগে প্রকৃত গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কংগ্রেসের কাছে সংবিধানের খসড়া দাবি করা উচিত। এই ভবিষ্যৎ সংবিধানে শোষিত শ্রেণীর জীবনের সুখ, সুরক্ষা ও মুক্তির ইতিবাচক ও সর্বসম্মত সুযোগ সুবিধা থাকলে তবেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

X

ভারতীয় রাজনীতিতে আগ্রহী বিশেষদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম দলে আছেন, যারা কিছুকালের জন্য ভারতে বেড়াতে এসে কিছুটা ধারণা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের ভারতের রাজনীতির জটিলতা এবং যে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো বিশদ তাত্ত্বিক গবেষণা নেই। দ্বিতীয় দলে আছেন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। যেমন, লুই ফিসার, কিংসলে মার্টিন, ব্রেলস্ফোর্ড এবং লাস্কি। এদের জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কংগ্রেসের প্রতি এঁদের সকলের সহমর্মিতা এক-ই ধরনের মিথ্যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বিশ্লেষণ যদি এই ভুল শোধরাতে সাহায্য করে, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

বিদেশিরা, যারা বেড়াতে এসে ভারতীয় রাজনীতির জটিলতা নিয়ে পড়াশুনা না করেই কংগ্রেসের সঙ্গে এক সুরে গলা মেলান—তাদের দোষ দেওয়া যায় না। সেই মিস্টার পিকিউইক যে স্যাম ওয়েলারকে বলেছিল—‘সব চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের ভিড়ে গিয়ে গলা মেলাবে’—বিদেশি পর্যটকরা আসলে এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতারা, ইউরোপ ও আমেরিকার চরমপন্থী বাম নেতারা লাস্কি, কিংসলে মার্টিন, ব্রেলস্ফোর্ড এবং আমেরিকার নেশন পত্রিকার সম্পাদক ও ইংল্যান্ডের ‘নিউ স্টেটসম্যান’ পত্রিকা, যাঁরা শোষণের বিরুদ্ধে গর্জন করে, তাঁরা যখন ভিড়ের সাথে গলা মেলায় তখন সত্যিই প্রচণ্ড ক্ষোভ হয়। এঁদের মতো প্রাজ্ঞজন কি করে কংগ্রেসকে সমর্থন করে তা বোধগম্য হয় না। তাঁরা কি জানেন না যে, কংগ্রেস আসলে শাসক শ্রেণী? তাঁরা কি জানেন না যে, ভারতে শাসক শ্রেণী আসলে ব্রাহ্মণ বেনিয়ার অশুভ আঁতাত? কংগ্রেসে সাধারণ মানুষকে শুধুই ভিড় জমাতে সদস্য করা হয়। কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে তাদের কোনও বক্তব্যই নেই। এসব তথ্য কি তাঁরা জানেন না?

সুলতান ইসলাম ধর্মকে বিলুপ্ত করতে পারেন নি। পোপ ক্যাথলিক ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। এক-ই রকম ভাবে ভারতে যতদিন ব্রাহ্মণরা শাসক শ্রেণীতে থাকবে এবং শূদ্র ও অচ্ছুৎদের নিপীড়নকে পবিত্র কর্তব্য মনে করবে, ততদিন অবধি ভারতের শাসক শ্রেণী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিনাশ করবে না। বিদেশি পণ্ডিতেরা কি একথা বুঝতে পারেন না? ভারতের শাসক শ্রেণী ভারতের জনসাধারণের একাংশ নয়। তারা সম্পূর্ণ পৃথক এবং নিজেদের পৃথক রাখতেই তারা ভালোবাসে। নীচ শ্রেণীর ছোঁয়া লেগে দূষিত হয়ে যাবার ভয়ে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসের ফলে তারা জাতের বাইরের মানুষের প্রতি বৈরি মনোভাব পোষণ করে। শোষিত শ্রেণীর দুঃখে তারা ব্যথিত হয় না। এদের কোনও রকম চাওয়া, ইচ্ছা বা প্রয়োজনকে শাসক শ্রেণী বিন্দুমাত্র আমল দেয় না বরং সে-সব কিছুকে দমিয়ে রাখতে এদের কৌশলের অভাব হয় না। শোষিত শ্রেণীর শিক্ষা বা চাকরিক্ষেত্রে উন্নতির কথা এরা স্বপ্নেও চিন্তা করে না। শাসক শ্রেণী কখনই এদের আত্মসম্মান এবং সন্ত্রমকে সম্মান জানানোর কোনও প্রয়াসকে সমর্থন করে না। বিদেশি পণ্ডিতেরা এসব ছাড়াও কি জানেন না যে, ভারতের স্বরাজের সাথে সে দেশেরই হয় কোটি অচ্ছুৎদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে?

একথা ভাবাই যায় না যে, ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতারা, বা কিংসলে মার্টিন, ব্রেলস্ফোর্ড এবং লাস্কি, যাঁরা মুক্তি ও গণতন্ত্রের ওপর লিখে আবিষ্কের শোষিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁরা ভারতের শোষিত শ্রেণী সম্পর্কে এসব তথ্য

জানেন না। তবুও তাঁরা ভারতের কথা উল্লেখ করেন কংগ্রেসকে সমর্থন করার জন্যেই। ভারতের অচ্ছুৎদের নিয়ে তারা খুব-ই কম আলোচনা করেছেন। অথচ এঁদের সমস্যাই বিপ্লবপন্থীরা এবং গণতান্ত্রিকদের আবৃষ্ট করার কথা। ভারতের জাতীয় জীবনকে অবজ্ঞা করে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে সমর্থনের ফলে প্রমাণিত হয়, যে এইসব বিদেশি বিদ্বজ্জনেরা কি পরিমাণ দিক ভুল করেছেন। কংগ্রেস যদি প্রকৃত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করত, তাহলে এই সমর্থন মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু কংগ্রেস কি তা করছে? এ কথা সবাই জানে যে, কংগ্রেস শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তির জন্যে লড়ছে, রাজনৈতিক গণতন্ত্রে তার কোন আগ্রহ নেই। ভারতে একমাত্র অচ্ছুৎরাই রাজনৈতিক গণতন্ত্রে জন্যে লড়াই করছে। কংগ্রেসের মুক্তির লড়াইয়ের সম্বন্ধে অচ্ছুৎরা ভীষণ-ই শক্তিত। এই লড়াইতে কংগ্রেস যদি জয়ী হয়, তবে তারা আরও শক্তিশালী এবং অত্যাচারী হয়ে উঠবে। হতদরিদ্র শোষিত মানুষের যদি সাংবিধানিক সুরক্ষা না থাকে, তবে এরা কোনদিনই উঠে দাঁড়াতে পারবে না। বিদেশি চরমপন্থী নেতাদের উচিত তাদের সমর্থন করা। কিন্তু অচ্ছুৎরা বহু বছর অপেক্ষা করে আছে এঁদের সহানুভূতি বা সমর্থনের জন্য। অথচ ইউরোপ এবং আমেরিকার এইসব চরমপন্থী এবং বামপন্থীরা কংগ্রেস ছাড়া আর কারও কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করে না।

কংগ্রেস আসলে পুঁজিপতি, জমিদার, সুদের ব্যবসায়ী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের দল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চরমপন্থী ও বামপন্থীরা এদের কি করে সমর্থন করে সেটাই আশ্চর্যের। এসব তথ্যের অজ্ঞতার জন্যেই বোধ হয় তারা কংগ্রেসি মার্ক স্বাধীনতার মোহে কংগ্রেসকে সমর্থন করে। সকল স্বাধীনতার লড়াইয়ের উদ্দেশ্য এক হয় না। তাই সব লড়াইয়ের নৈতিক চরিত্রও এক হয় না। ইংরেজদের ইতিহাস থেকেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। জনের বিরুদ্ধ ব্যারনদের বিদ্রোহের ফলে ‘ম্যাগনা কার্টা’ সৃষ্টি হয়। এই লড়াইকে হয়তো স্বাধীনতার লড়াই বলা চলে। কিন্তু কোনও গণতান্ত্রিক কি লেভেলার বিদ্রোহ বা কৃষক বিদ্রোহকে শুধুমাত্র স্বাধীনতার লড়াই বলে এক-ই রকম দায়সারা ভাবে সমর্থন করতে পারবেন? তাঁরা যদি সমর্থন করেন তবে তা স্বাধীনতার নামে মিথ্যে উদ্দেশ্যকেই সমর্থন করা হবে। যদি কোনও নিরক্ষর দল, যারা বেঁচে থাকবার স্বাধীনতা এবং শোষণ করার স্বাধীনতার পার্থক্য বুঝতে না পেরে এদের সমর্থন করে, তাহলে তা ক্ষমা করা যেত। কিন্তু গণতন্ত্রের সুপরিচিত নেতৃবর্গ এবং লাস্কি, কিংস্লে মার্টিন, সিলস্ফোর্ড, লুই ফিশার, যাঁরা চরমপন্থী এবং বামপন্থী হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত, তাঁদের এই আচরণ কোনভাবেই মার্জনা করা যায় না।

এঁদের যখন প্রশ্ন করা হয়, কেন তারা সত্যিকারের গণতন্ত্রের জন্য যেসব ভারতীয় দল রয়েছে, তাদের সমর্থন করেন না, এখন তাঁরা উল্টে জানতে চান, এইসব দলের অস্তিত্বের কথা। যখন তাদের এই সব দলের অস্তিত্বের কথা জানানো হয়, তখন তাঁরা জানতে চান, সংবাদপত্রে কেন এদের খবর ছাপা হয় না! এরপর যখন তাদের বলা হয়, যে সংবাদ মাধ্যম কংগ্রেসের পক্ষে তখন তারা আরও বিস্ময়ে জানতে চান যে, ইংরেজি কাগজগুলির বৈদেশিক সংবাদদাতা কেন এদের সম্বন্ধে লেখেন না। এসব সংবাদদাতাদের থেকে এর চেয়ে যে ভাল কিছু আশা করা যায় না, তা আমি আগেই দেখিয়েছি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের থেকে বিদেশি সংবাদ সংস্থাগুলি কোন অংশে ভাল নয়। এর থেকে ভাল অবশ্য আশা করাও যায় না। ভারতবর্ষে অনেকেই তথাকথিত বৈদেশিক সংবাদদাতা আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা ভারতীয়। খুব কম সংখ্যকই বিদেশি। যে সব ভারতীয় বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করা হয়, তাঁদের অধিকাংশ সময়েই কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় পাওয়া যায়। যেসব বিদেশি, বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে ভারতে আছেন, তাঁদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যাঁরা আমেরিকান তাঁরা সঙ্গত কারণেই ব্রিটিশ বিরোধী এবং স্বভাবতই তাঁরা কংগ্রেসের পক্ষে। তীব্র ব্রিটিশ বিরোধিতা না করলে ভারতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতি এঁদের কোন আগ্রহ নেই। যারা কংগ্রেসের সদস্য নয়, তারা বলতে পারবেন, যে ১৯৪১-৪২ সালে আমেরিকান সংবাদদাতারা যাঁরা যুদ্ধের খবর করতে এ দেশে এসেছিলেন, তাঁদের নিয়ে কি ধরনের মুশ্কিলে পড়তে হয়েছিল। এঁরা মানতেই চান নি যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতে অন্য কোনও রাজনৈতিক দল আছে। অন্য কোনও দলের সম্পর্কে এঁদের আগ্রহী করে তোলা তার চেয়েও মুশ্কিল হয়েছিল। অনেক সময় পরে তাঁরা কংগ্রেসকে গালিগালাজ করেন অথবা ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে এঁরা বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ব্রিটিশ বৈদেশিক সংবাদদাতারাও এঁদের চেয়ে বিন্দুমাত্র ভাল নয়। তাঁরাও ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতিকেই একমাত্র সংবাদ হওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন। যেসব রাজনৈতিক দল দেশকে মুক্ত করে সুরক্ষিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, তাদের প্রতি এঁদের প্রবল অনীহা। এর ফলে ভারতীয় সংবাদপত্র এবং বিদেশি সংবাদপত্র, ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে এক-ইরকম খবর ছাপে।

বিপ্লবপন্থীরা এইসব কারণগুলি নিশ্চয়-ই চেষ্টা করলে বুঝতে পারবেন। সংবাদদাতা থাক বা না থাক, প্রকৃত গণতন্ত্র যাতে বেঁচে থাকে, তারজন্য তাদের-ই সংগ্রামী মানুষদের সাথে যোগাযোগ রাখা কর্তব্য। এটা খুব-ই দুঃখের যে, ইংল্যান্ড ও

আমেরিকার বিপ্লবপন্থীরা প্রকৃত সাহায্য প্রার্থী সহযোগীদের সাহায্য করতে ভুলে গিয়েছেন। এই সব ভারতীয় রক্ষণশীলরা মুক্তির শ্লোগান অপব্যবহার করে গোটা বিশ্বকে বোকা বানিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখতে চাইছেন।

কংগ্রেসের তৈরি এই কুয়াশা থেকে তারা যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারেন ততই ভাল। তখন-ই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্ত শাসন, সকলের মুক্তির অধিকার সুরক্ষিত না হলে, কখনই বাস্তব হতে পারে না। তবুও কংগ্রেসের এই ঢকা-নিমাদ বাস্তবের সঙ্গে তুলনা না করে, তারা যদি অন্ধের মতো কংগ্রেসকেই সমর্থন করতে থাকেন, তাহলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে তাঁরা ভারতের আপামর জনগণের বন্ধু কখনই নন। ভারতের স্বাধীনতার পথে তাঁরা বরং বাধা হয়ে রয়েছেন। যে অপরাধী অত্যাচারের জন্য শাস্তি পাচ্ছে এবং যে শোষিতরা অপরাধীর হাত থেকে রেহাই চাইছে, তাঁরা তাদের মুক্তি প্রার্থনার পার্থক্যটুকুও বুঝতে পারেন না। তাড়াহুড়ো করে ভারতের স্বাধীনতা আনার উদ্দেশ্যে, কংগ্রেসের পক্ষ নিয়ে তাঁরা ভারতীয় গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত না করে, অত্যাচারীকেই মুক্তি দিতে চাইছে। এঁদের কি বলে দিতে হবে যে, কংগ্রেসকে সমর্থন করার অর্থ অত্যাচারকে ক্রীতদাস করে রাখার স্বাধীনতা দেওয়া? শোষিত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সমর্থক হিসাবে নিজেদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে গেলে, কংগ্রেসের প্রতি এঁদের আচরণ পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

□ □ □

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : সপ্তদশ খণ্ড

অনুবাদে

- ভবেন্দ্র দাস—বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। অনার্য মিত্র ছদ্মনামে ছড়া লিখে দ্বিষণীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের বার্তা-সম্পাদক।

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল—বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক। বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত। বাংলা ও ইংরেজিতে সত্তরের মতো গ্রন্থের লেখক।

নির্ঘণ্ট

অচ্ছুৎ, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,
২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১,
৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০,
৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮,
৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬০,
৬১, ৮৪, ৮৪, ১০২, ১০৩

অর্জুন লাল, ৭৫

অভিজাত শ্রেণী, ৮৭

‘অল-ইন্ডিয়া সিডিউলড কাস্টস্
ফেডারেশন’, ৫৭

অস্পৃশ্যতা, ৪৮

আমেরিকা, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ১০৩, ১০৪

আমেরিকান, ৯৯, ১০২

আরউইন, লর্ড, ৭৬

আরব, ১৭

আলস্টার, ৪৮

আয়ারল্যান্ড, ৪৮, ৭৬, ৯৬

‘অ্যাকাউন্ট অব্ দি ইস্ট ইন্ডিয়া’, ৬৮

অ্যাডামস্, জন, ৫৩

ইউরোপ, ২৮, ১০২, ১০৩

ইউরোপীয়, ৪৩, ৪৫

ইতালি, ৬৩, ৬৪

ইনস্, শ্রী সি. এ., ৬৮

ইসলাম, ৯৭, ১০২

ইহুদি, ১৭, ১৮, ২১, ৮৫, ৯৪

‘ইনস্টিটিউট অব্ ইন্টারন্যাশনাল
অ্যাক্ফেয়ার্স’, ৯২

‘ইনস্টিটিউট অব্ প্যাসিফিক
রিলেশনস্’, ১৭, ২২

ইংল্যান্ড, ২৮, ৬৪, ১০৪

‘এটা’, ৮৭

এলফিনস্টোন কলেজ, ৯১

এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ৫৮

ওয়ার্ড, ২১

কংগ্রেস, ২১, ২২, ২৬, ২৭, ৪৯,
৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৬৯,
৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৬, ৮১, ৮২,
৮৩, ৮৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১,
১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫

কংগ্রেস হাইকমান্ড, ৮১

কারসন, ৪৮, ৫৩

কুমোর, ৭৫

কৃষক বিদ্রোহ, ১০৩

কৃষ্ণমূর্তি, শ্রী ওয়াই. জি. ৭৪

ক্যাথলিক ধর্ম, ১০২

ক্সিস্টান, ১৯

গান্ধী, শ্রী, ২৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২,
৫৩, ৬৯, ৭১, ৭৫, ৭৬

গান্ধীবাদ, ১০০

গুরু, গোসাঁই আগমদাস, ৭৫

গোদা, ভগত চাঁদিমাল, ৭৫

গোপালাচারি, শ্রী রাজা, ৪৭, ৪৮

গ্রিক, ৯৪

গ্রোট, ৬১

ঘাফি, ৭৩, ৭৪

চতুর্দশ লুই, ৯৭

চার্চিল উইনস্টন, ৪৯

চুম্ব, ৭৫

চৌধুরি, বংশীলাল, ৭৫

জন, ১০৩

জার্মান, ৩৬, ৮৫, ৯৪

জাপান, ৮৭, ৮৮

জার্মানি, ৬৩, ৬৪, ৮৯

‘জাস্টিস্ পার্টি’, ৫৭

জেফারসন, ৫১, ৫২

জেমস্, দ্বিতীয় ৯৭

‘টাইম অব ইন্ডিয়া’, ৯৩

ডড, ৭১

ডাইসি, অধ্যাপক, ৩৫, ৯৬, ৯৭

ডাল্ডি অভিযান, ৭৬

তফসিলি জাত, ২৩, ২৪, ২৫

তিলক, শ্রী, ৭৩, ৭৪, ৭৫

তুর্কি, ৯৪

‘দি নেশন’, ২১

‘দামিয়োজ’, ৮৭, ৮৮

‘নবজীবন আন্দোলন’, ৩৯

নাৎসি, ১৭, ১৮

নাভে, ৯৭

নাপিত, ৭৫, ৭৬

‘নিউ স্টেটসম্যান’, ১০২

নিগ্রো, ১৮, ২১, ৫১, ৮৫
 নেহরু, জওহরলাল, ৫২, ৭৪, ৭৫
 পরাজপে, ডা: আর. পি., ৮৯
 পণ্ডিত, শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী, ৭৪
 'পারি কমিউন', ৯৮
 পালি, ৯৩
 'পার্লামেন্টারি ম্যানুয়াল', ৭১
 'পিনকারটন ভয়েজেস্', ৬৮
 পীরবক্স, আল্লাবক্স, ৯০
 পিকউইক, মি:, ১০২
 'পুষ্ক', ৮৯
 পোপ, ৯৭, ১০২
 পোল, ৯৪
 প্যাটেল, বল্লভভাই, ৭৪, ৭৫
 'প্যাসিফিক রিলেসনস্', ১৭
 ফরাসি, ৩৬, ৮৫, ৮৭, ৯৪, ৯৬
 ফরাসি বিপ্লব, ৮৭
 ফাগুয়া, রোহিদাস, ৭৫
 ফিশার, লুই, ৬৯, ১০১, ১০৩
 ফ্রান্স, ৮৭

ভট্টাচার্য, জগন্নাথ, ৯১
 'ভারত মহিলা সম্মেলন', ৭৪
 'ভারত শাসন আইন', ২৩, ২৬, ৪০, ৯০, ৯২
 বাইবেল, ৪১, ৯৫
 বেইনস্, ৮৪
 বেনিয়া শ্রেণী, ৬৯, ৭১, ৮৬, ১০২
 বোমানজি, ৯২
 ব্যানারম্যান, ক্যাম্পবেল, ৯৬
 ব্রাহ্মণ, ৬৬, ৬৭, ৬৮
 ব্রেলস্ফোর্ড, ১০১, ১০২, ১০৩
 'ব্রিটিশ লেবার পার্টি', ১০৩
 মনু, ৮৬
 মনুস্মৃতি, ৯৫
 মহম্মদ, ৯৭
 মার্কস্, কার্ল, ৯৮
 মার্টিন কিংসলে, ১০১, ১০২, ১০৩
 মানগভকর, শ্রী জি. পি., ৫৫
 মালথুসীয়, ১৯
 মুচি, ৭৩, ৭৪, ৭৫

মুসলমান, ১৯, ২১, ৩৫, ৪৭, ৪৮,
৫৭, ৯৭

মুসলিম লীগ, ৪৭, ৫৭, ৭৪

‘ম্যাগনা কার্টা’, ১০৩

মঁ ট্রম্বলঁ, ১৭

যাজিক, ৮৭

রামদিন, মাতাদিন, ৯০

‘রয়াল কমিশন’, ৮৯

রামস্বামী, ৯০

রায়, স্যার পি. সি., ৬৭

রাশিয়া, ৬৩, ৬৪

রাস্ত রাহাবার’, ৭৪

বুশ, ৯৪

রেডমন্ড, ৪৮

রোমান, ২১, ৯৭

রোমান ক্যাথলিক মতবাদ, ৯৭

রোমান সম্রাট, ৯৬

‘লবণ-আইন অমান্য, ৭৬

লাস্কি, ১০১, ১০২, ১০৩

লিনলিথগো, লর্ড, ৭৪

লুজো-ভিকো ডি ভারথেমা, ৬৮

‘লেভেলার বিদ্রোহ’, ১০৩

শিখ, ১৯, ৪৭

শূদ্র, ৮৪, ৮৫, ৯৫

শ্রফ, দামু, ৯৩, ১০২

সনু, রামজি, ৯৩

সলিসবেরি, লর্ড, ৯৬

‘সম্বন্ধ’, ৬৮

‘সামুরাই’, ৮৭, ৮৮

সিজার, ৯৭

‘সিন-ফিয়েন পার্টি’, ৭৬

সীতারামাইয়া, ডা: পট্টভি, ৭৪, ৭৬

সুলতান, ৯৭, ১০২

সোভিয়েত রাশিয়া, ৯৮

স্যাম্ ওয়েলার, ১০২

স্পার্টার, ২১

স্পেন, ৬৩

স্টেটসম্যান ;. ২১

স্বরাজ, ২৪, ১০০, ১০২

‘হরিজন সেবক সংঘ’, ৫১, ৫২

হিটলার, ৪৯

হিন্দুধর্ম, ৪৩, ৫৩

হিন্দু, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২,

হিন্দুরাজ, ২৪

২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০,

হিন্দু মহাসভা, ৭৪

৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮,

'হেমিন', ৮৭

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫,

৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩,

হেলট, ২১

৭৬, ৮৪, ৮৫, ৯৫,

